রেগিস্থান রাজস্থান

শতদল ভট্টাচার্য

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ ১৯৬০

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নানা কাগজে ছোট গল্প, ছড়া, এই সব লিখতাম। আমার সাহিত্যে হাতেখড়ি মার্বেল প্যালেসে কবি বীরেন্দ্র মল্লিকের কাছে। ১৯৫৫ সালে রম্য-রচনা ও কার্টুনে হাতেখড়ি 'ষষ্টিমধু' পত্রিকার সম্পাদক কুমারেশদার (কুমারেশ ঘোষ) কাছে। কিন্তু আমার লেখার ধারার মোড় ঘোরালেন যিনি, তিনি হলেন 'নব কল্লোল'এর কর্ণধারদের অন্যতম, আমার অগ্রজপ্রতিম স্বর্গত ক্ষীরোদ মজুমদার। ১৯৬৭ সালে বোম্বাই গিয়েছিলাম আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা দেখতে। আমার বোম্বাই-ভ্রমণ বর্ণনা হয়তো মনোরম হয়েছিল। ক্ষীরোদদা শুনে উৎসাহিত করলেন 'নব কল্লোল'এ ঐ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে। লিখলাম 'নব কল্লোল'এ প্রথম ভ্রমণ কাহিনী 'বিচিত্র বন্দর বোম্বাই'। সেই সঙ্গে ফটো-সাংবাদিকতার দিকে এগিয়ে যেতেও উৎসাহিত করলেন। দেব সাহিত্য কুটীরের কর্ণধারদের আর একজন হলেন শ্রদ্ধেয় মধুসূদনদা (মধুসূদন মজুমদার)। তিনিও 'শুকতারা' ও পূজাবার্ষিকীতে ভ্রমণ ফিচার (ফটোগ্রাফি সমেত) লেখার সুযোগ দিলেন।

৺ক্ষীরোদদার সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর প্রবীর মজুমদার তাঁর নিউ বেঙ্গল প্রেস থেকে আমার রাজস্থান ভ্রমণ 'রেগিস্থান রাজস্থান' প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে যেমন ভ্রমণ ও ফটো-সাংবাদিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অকৃপণ সহায়তা করলেন, তেমনই ৺ক্ষীরোদদা, মধুসূদনদার সঙ্গে তিনিও আমায় অশেষ কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করলেন।

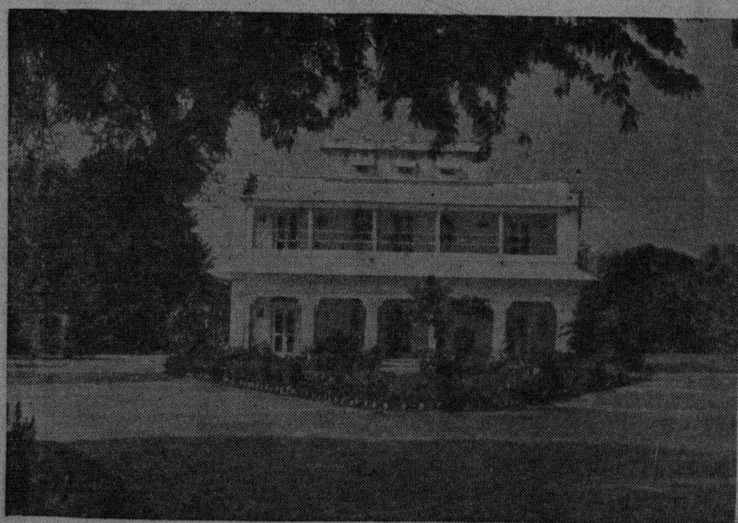
—শতদল ভট্টাচার্য

যিনি আমার দেশ ভ্রমণে বেরোবার আগে প্রায় প্রতিবারই উদ্বিগ্ন হতেন এই চিন্তায় যে, কত দূর যাচ্ছি, কবে ফিরব? কিন্তু ভ্রমণ সেরে ফিরে আসলে কত জায়গা দেখে এলাম, কত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম, এই ভেবে সব থেকে তিনিই বেশী আনন্দিত হতেন, তিনি আমার ৺মা। তাঁর শ্রীচরণে—

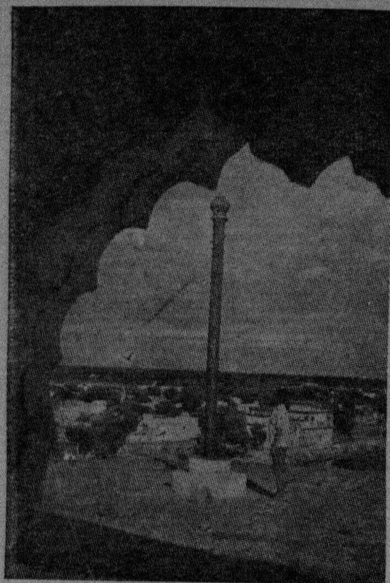
—লেখক



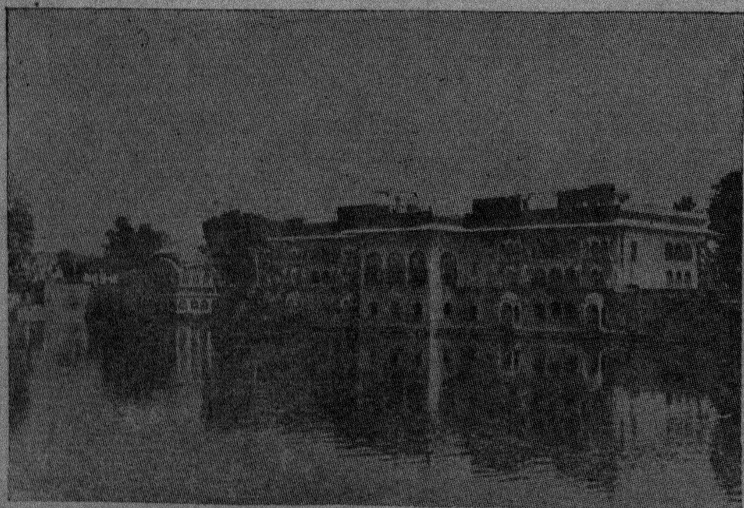
ভরতপুরের 'বার্ড স্যাংচুয়ারী'র স্বাধীন
পাখিরা।



ভরতপুরের অরণ্যনিবাস 'শান্তি কুটির'।



ভরতপুর কেল্লায় প্রস্তর স্তম্ভ। এর গায়ে আড়াইশ জাট রাজার নাম খোদাই করা আছে।



রাজা জহরসিংয়ের রাজধানী 'দিগ'এ গোপাল বাগের জলমহল।



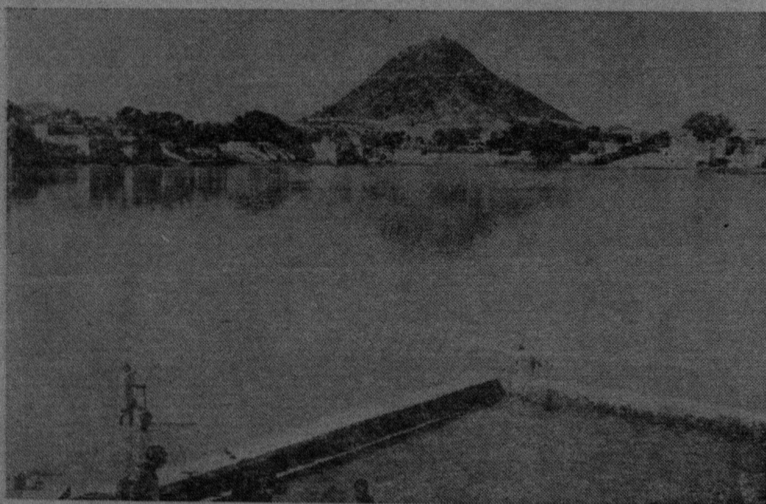
অম্বরের জগৎশিরোমণি মন্দির। মন্দিরটি নারায়ণের।



অম্বরকেল্লা চত্বরে অপেক্ষমাণ হাতীর দল। এরা অপেক্ষা করে থাকে
কখন এদের ডাক পড়বে পর্যটকদের পিঠে
নিয়ে কেল্লা ঘোরাবার।



পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার মন্দির। শঙ্করাচার্য
এ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন।



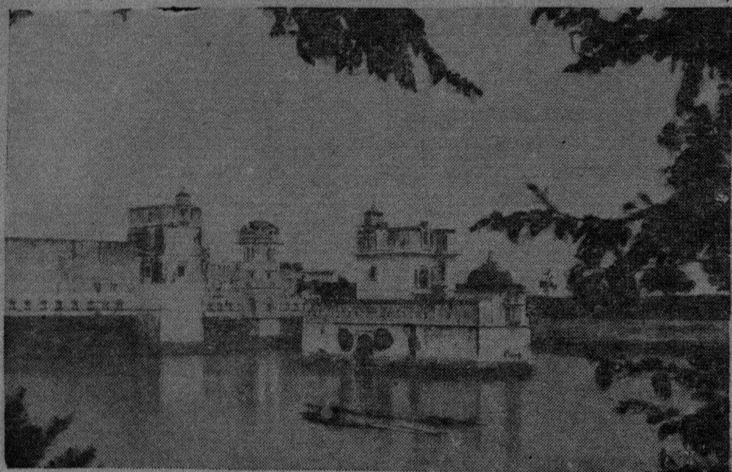
সাবিত্রী-পুষ্করতীর্থের পুষ্কর হ্রদ। দূরে দেখা যাচ্ছে সাবিত্রী
পাহাড়, চূড়োয় সাবিত্রী দেবীর মন্দির।



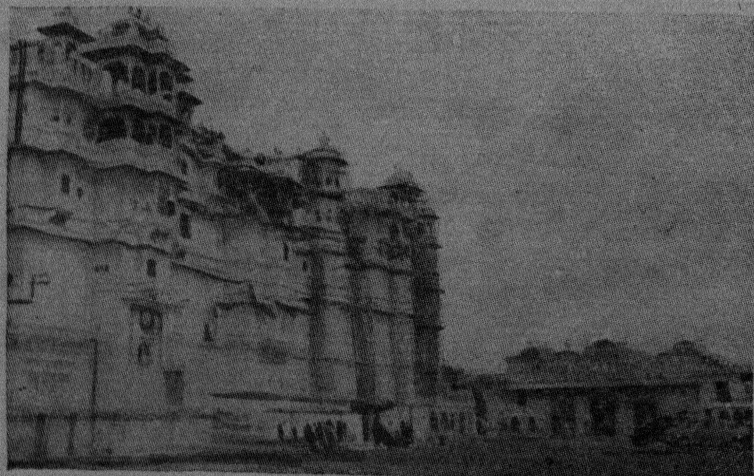
আঢ়াইদিনকা ঝোপড়া —আজমীর।



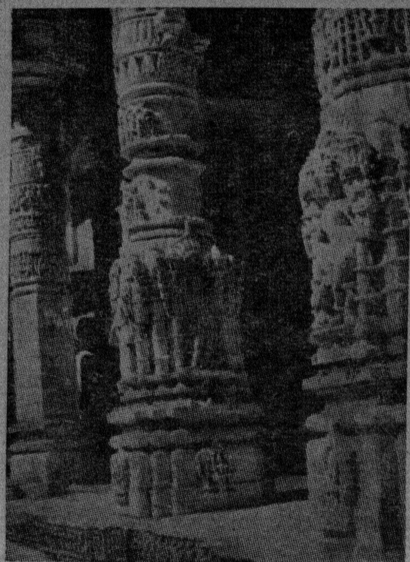
চিতোরগড়ের কুম্ভ-শ্যাম মন্দির। মীরাবাঈ এই মন্দিরেই
গিরিধারীকে নিয়ে দিন কাটাতেন।



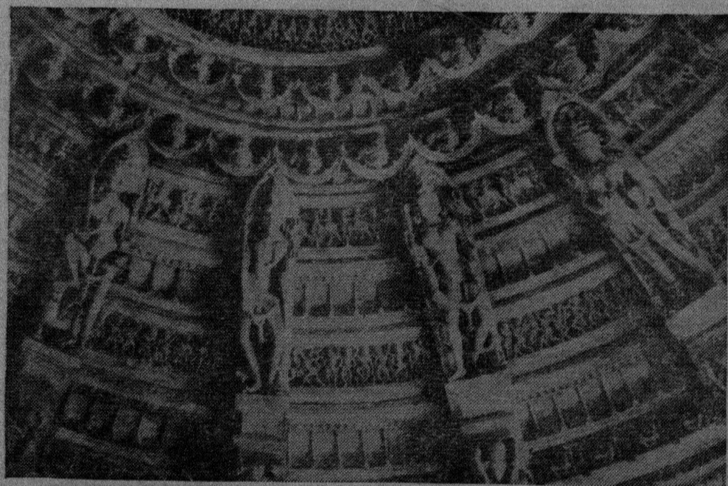
চিতোরগড়ে রানী পদ্মিনীর মহল ও সামনে
পদ্মিনীর জলমহল।



উদয়পুর রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে দেখতে পাওয়া যাবে
সেই গিরিধারীর মূর্তি যাঁকে মীরাবাঈ পুজো করতেন।



দিলওয়ারা মন্দিরের থাম।
মাউন্ট আবু।



দিলওয়ারা মন্দিরের সিলিংয়ের কাজ।
মাউন্ট আবু।



মাউন্ট আবু শহর থেকে ৭ মাইল দূরে অচলগড়ে চামুণ্ডা দেবী
এবং জৈন মন্দির দেখতে দুর্গম পথে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা
এই ভাবেই ডুলিতে চড়ে যায়।



রাজস্থানের মেয়েরা।

[বইটির সমস্ত আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।]

ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে কি থাকে? মানে ভ্রমণের প্রাসঙ্গিক কথা ছাড়া আর কি থাকে? হয়তো অনেক কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের বাংলা ভ্রমণকাহিনীতে একটা বিশেষ ফ্যাশন এসে গেছে। সে ফ্যাশনটি হল সারা বইটি জুড়ে একটি মেয়ে থাকবে। সে হয়তো নায়িকা হতে চায় না, কিন্তু গল্পাংশে নিজেকে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে চায়। ঠিক এই জন্যে আমি যখন কোন একটা কাগজের 'প্রেস কার্ড' পকেটে নিয়ে রাজস্থান পরিক্রমার জন্যে তৈরি হলাম, সঙ্গে কোন নারীচরিত্র না রাখারই সংকল্প করলাম।

কিন্তু 'ম্যান প্রপোজেস্ গড ডিস্‌পোজেস্' প্রবাদ আবার সত্যি হল। রুমী ধরে বসল আমার সঙ্গে যাবেই।

বলল—মীরাবাই পদ্মিনী কর্ণবতীর দেশ দেখব না, এ হতেই পারে না। আমি যাবই।

ইতিহাসের ছাত্রী সে নয়। তবু রাজস্থানের মহিমা যেমন সকলের চেতনায় মিশে আছে তেমনি রুমীর মনে ছেলেবেলা থেকেই সে দেশের কল্পনা লক্ষ্মীর ঘটের মত সযত্নে পাতা আছে। আমাকে প্রায়ই বেরিয়ে পড়তে হয় কাঁধে ক্যামেরা আর পকেটে নোট-বই নিয়ে, দূরে কাছে নানা জায়গায়। অন্য অন্য বার ও বিশেষ জেদ করে নি। কিন্তু এবারে ও অ্যাডামাণ্ট।

সময়টা ১৯৭১ সাল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান হানা দিয়েছে। যাব অনেক দূর—জয়শলমীর, বেরমের আরও কত সীমান্ত এলাকায়। বললাম আমার আশঙ্কার কথা। সব শোনার পর সে বলল—তা হোক। তুমি তো রাজনৈতিক সংবাদদাতা নও, কাজেই রণাঙ্গনে তোমার দিন কাটবে না। বিলকুল ট্যুরিজম্‌ই তোমার সাবজেক্ট!

রুমীকে এড়াবার শেষ চেষ্টা এবার। বললাম—যদি একটা উত্তর ঠিক দিতে পার তোমায় সঙ্গে নেব। মনে রেখ, এটাই তোমার লটারি।

রুমী বলল—বল!

বললাম—মীরাবাই পদ্মিনী এনাদের কাহিনী সকলেই জানে, কিন্তু তুমি একটু আগে কর্ণবতীর নামও বলেছ। কর্ণবতীর ব্যাপারটা কি যদি বলতে পার তাহলে পাস।

রুমী বলতে শুরু করল—চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহের স্ত্রী ও রাণা উদয়সিংহের মা হলেন কর্ণবতী। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গুজরাটরাজ পাঠান সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করল। উদয়সিংহ তখন শিশু। কর্ণবতী যোদ্ধৃবেশে রাজপুত বীরদের নিয়ে সুলতানকে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হতে চলল দেখে রাজপুত প্রথামত তিনি সাহায্যের আশায় দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনকে রাখী পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে একটা চিরকুটে লিখে দিলেন—আপনার ভগিনী বিপদগ্রস্ত।

রাজপুত প্রথানুসারে যদি কেউ রাখী পাঠায় তাহলে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে একটা ধর্মসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং প্রাপক প্রেরককে প্রয়োজনে যে কোনরকম সাহায্য করতে বাধ্য থাকে। রাজপুত সমাজে এইরকম রাখী পাওয়া খুব সম্মানের মনে করা হয়। হুমায়ুন তখন বাংলা-দেশে একটা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু কর্ণবতীর কাছ থেকে রাখী পাওয়া মাত্র তখনই রাখী-বোনকে সাহায্য করার জন্যে তাড়াতাড়ি চিতোরের দিকে রওনা দিলেন। বাংলাদেশ আর চিতোরের মধ্যে সুদূর পথ। হুমায়ুন যখন এসে পৌঁছলেন, চিতোরের সব শেষ। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কর্ণবতী রাজপুত নারীদের নিয়ে জহরব্রত করে প্রাণ দিয়েছেন, আর বীরেরা রণক্ষেত্রে চিরশায়িত। যাই হোক, হুমায়ুন গুজরাটের সুলতানকে পরাজিত করে চিতোর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মালবের রাজা সুলতানকে সাহায্য করেছিল বলে তাকেও রাজ্যচ্যুত করে সেই সিংহাসনে মালবরাজের ছেলে বিক্রমজিতকে বসিয়ে দিলেন। হুমায়ুন রাখী-বোনের জন্যে করলেন সব-কিছু কিন্তু তা কর্ণবতী আর দেখে যেতে পারলেন না। তা হোক্, তবু তাঁর রাখীর সম্বন্ধ এই বিংশ শতাব্দীতে অক্ষয় হয়ে আছে কবিগুরুর প্রচলিত রাখী-উৎসবের মধ্যে দিয়ে।

কথা শেষ করে রুমী বলল—কেমন, পাস করেছি তো?

সহাস্যে বললাম—সম্মানের সঙ্গে।

রুমীকে সঙ্গে নিতে হল।

রুমী উত্তেজনায় দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরে বলল—উঃ! কী থ্রীল।

বললাম—দাঁড়াও, থ্রীলের এই তো সবে শুরু।

রুমী খুব শক্ত করে আমার বাঁ হাতটা ধরে আছে। বলল—এমন অভিজ্ঞতা আমার যে কখনও হবে ভেবেছি কি? লোকের মুখে এমন ঘটনা অনেক শুনেছি, কিন্তু এ যে এখন নিজের জীবনে ঘটছে!

বললাম—এবার আমার ওপর প্রসন্ন হয়েছো তো দেবী? এখানে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিলে তুমি বিরূপ, এমন কি রেস্টহাউসের খোঁজে সাইকেল-রিকশায় বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন মাইল দুয়েক পাড়ি দিচ্ছিলাম তখনও দেখেছি দেবী, তব শ্রাবণ-ঘনঘটা আননখানি।

অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে জীপে যেতে যেতে রুমীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রাজস্থানের ভরতপুর ওয়াইল্ড্ লাইফ স্যাংচুয়ারি।

উত্তর ভারত থেকে রাজস্থানে ঢুকতে গেলে ভরতপুরই প্রথম আকর্ষণ। এদিক দিয়ে রাজস্থানে ঢুকলে সবার আগে টানবে এই ভরতপুর। লোকে দিল্লী বা আগ্রা থেকে সোজা চলে যায় জয়পুর। ভরতপুরে বিশেষ নামে না কেন তা কে জানে! অথচ আগ্রা থেকে মাত্র ৩৪ মাইল।

রাজস্থানের বিশেষত্ব রুক্ষতা আর দৃঢ়তা। অর্থাৎ মরুভূমি আর কেল্লা রাজস্থান তাই 'রেগিস্থান'। বালি আর পাথুরে মাটিকে ফারসীতে বলে 'রেগি'। যেখানেই খানিক উঁচু পাহাড় পাওয়া গেছে সেখানেই চোখে পড়বে কেল্লা। যে পাহাড়ের মাথায় কেল্লা নেই সে পাহাড়ের মাথা কিন্তু নেড়া নয়, সেখানে দেখা যাবে একজাতীয় প্রাসাদ। সেটা কি? সেটা হল 'শিকার মহল'। সে যুগে শিকার করবার ধারাই ছিল অন্যরকম। এখনকার শিকারীদের মত সে যুগের রাজারাজড়ারা তো কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন না, কাজেই তাঁরা প্রচুর খাবার-দাবার, লোক-লস্কর, চেলা-চামুণ্ডা সব নিয়ে চলতেন শিকারে। তারপর কতদিন পরে থাকতেন বনে। রাজারা সব আসতেন প্রাসাদ ছেড়ে, বরাবর বিলাসের ভেতর জীবন কাটান, কিন্তু অবসর বিনোদন করতে এসে কি কষ্ট করা যায়! কাজেই বনের মধ্যেও বানানো হত শিকার মহল, যাতে রাজাদের কোন অসুবিধে না হয়। গাইড্ বলে না দিলে ধরা কঠিন কোন্‌টা শিকার মহল আর কোন্‌টা রাজপ্রাসাদ।

ভরতপুর যদিও রাজস্থানের খুব পুরোনো শহর নয়, কিন্তু এ শহর প্রতিষ্ঠা যিনি করেছিলেন তিনি ছিলেন রাজস্থানের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অতি পরাক্রান্ত যোদ্ধা। রাজস্থানের প্রধান দুই জাত রাজপুত ও জাট। ১৭৩০ সালে ভরতপুরের প্রতিষ্ঠা করেন জাটরাজা সূরযমল। অতি বীর সূরযমল শান্তিতে একটা মাসও কাটাতে পারতেন না। কেবলই বাইরের শত্রুর আক্রমণ। মোগল আক্রমণে জর্জরিত হয়ে থাকতে হত। ভরতপুর দিল্লী থেকে ১১৫ মাইল এবং আগ্রা থেকে মাত্র ৩৪ মাইল। মোগল অশ্বারোহীদের কাছে এই ক'মাইল কিছু নয়। তাই দিল্লীর সিংহাসনে যখনই কোন বাদশা বসত তখনই রাজস্থানকে পাবার জন্যে তার মাথা ব্যথা শুরু হত। আর রাজস্থানে ঢোকার মুখেই পড়ে

ভরতপুর। কিন্তু হলে হবে কি? প্রচণ্ড বাধা সেখানে। বার বার মোগল বাদশা ভরতপুর আক্রমণ করে আর জাটের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে আবার উত্তরপ্রদেশে ফিরে যায়। ১৭৬৫ সাল ভরতপুরের ভাগ্যে এক সোনার বছর। বাহাদুর বীর সূরযমল এবার কেবল মোগল আক্রমণ প্রতিহত করলেন তাই নয়, ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চললেন দিল্লী পর্যন্ত। এবার জয়লক্ষ্মী রাজার সঙ্গে। দিল্লী-জয়ের নিদর্শন হিসেবে নিয়ে এলেন মেহগনি কাঠের ওপর সোনা-চাঁদির কাজ করা বিরাট দুটি দরজা। সেই দরজা বা পোল দুটিকে লাগানো হল ভরতপুর কেল্লায় দিল্লীর দিকে মুখ করে। মোগল যুগের পরে এল ইংরেজদের যুগ। ভরতপুর কিন্তু তখনও শান্তি পায় নি। ইংরেজ পল্টনদের সঙ্গেও তাকে সমানে লড়তে হয়েছে। অবশেষে রণক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত ভরতপুর একদিন সত্যি সত্যি শেষ হয়ে গেল ইংরেজের হাতে। ১৮২৬ সালে।

রাজস্থানের অন্যান্য কেল্লা থেকে ভরতপুর কেল্লার পার্থক্য হল এ কেল্লা পাহাড়ের ওপরে নয়, প্রায় নগরের সমতলে বলা যায়। কাজেই প্রকৃতি এর দুর্ভেদ্যতা সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করতে পারে নি। কিন্তু মানুষ দমবার জন্যে জন্মায় নি। প্রকৃতি বাধ সাধলেও সূরযমল চেষ্টা করেছিলেন এ দুর্গকে যথেষ্ট দুর্ভেদ্য করতে। কতখানি দুর্ভেদ্য করার চেষ্টা করা হয়েছিল তার একটু বর্ণনা করা যাক। মূল দুর্গটিকে করা হয়েছিল কেন্দ্রস্থলে। তাকে ঘিরে কিছু দূর অন্তর অন্তর দুটি বিশাল প্রাকার করা হয়েছিল আর প্রত্যেকটি প্রাকার ঘিরে ছিল দুটি গভীর চওড়া খাদ। ১৫০ ফুট চওড়া আর প্রায় ৫০ ফুট গভীর খাদ। কি সুন্দর পরিকল্পনা! প্রথম দুর্গ-প্রাকার যা দ্বিতীয় পরিখা, প্রাকার এবং মূল দুর্গকে ঘিরে রেখেছে, তাকে একবার প্রদক্ষিণ যদি করে আসা যায় দেখা যাবে ৭ মাইল ঘুরে আসা হয়েছে। এতগুলো প্রাকার এবং পরিখা করবার কারণ ছিল যে, শত্রুরা এতগুলো সামনের বাধা পার হয়ে মূল দুর্গকে যাতে সহজে ছুঁতে না পারে। কারণ সেখানেই তো রাজপ্রাসাদ; মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্রমিত্র, সবাই থাকতেন। প্রথম পরিখার জন্যে হত প্রথম প্রাকার দুর্ভেদ্য। কোন কারণে তার দুর্ভেদ্যতা নষ্ট হলে আছে দ্বিতীয় পরিখা এবং প্রাকার। সুতরাং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মূল দুর্গ থাকত নিরাপদ। কিন্তু হায়! ভরতপুরের জাটরাজার দুর্ভাগ্য। এত সত্ত্বেও ইংরেজ ও মোগলদের দুঃস্বপ্নের ভরতপুর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

রুমীকে বললাম—এখন খুব ভাল লাগছে বলছ, কিন্তু আজ সকালে কি কাণ্ডই না করছিলে। শহর ছেড়ে বনের ভেতর দিয়ে যখন দু'মাইল পথ সাইকেল-রিকশায় পাড়ি দিতে দিতে চারিদিকে কোন লোকালয় দেখতে পাচ্ছিলে না তখন কী বাক্যবাণই না আমার ওপর প্রয়োগ করছিলে!…

আমাকে থামিয়ে রুমী বলল—কি বলেছি?

বললাম—কী বল নি?

—কি বলেছি বল!

—বল নি তুমি যে, শহরে হোটেল থাকা সত্ত্বেও একদম নিরিবিলিতে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি তার মানে তোমাকে আরও একলা করে পাব।

রুমীর বোধহয় এবারে লজ্জা লাগল। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে না পেলেও টের পেতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে ওর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমাকে একটা টোকা মেরে আস্তে আস্তে বলল—অ্যাই, ওরা শুনতে পাবে।

আমি বললাম—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার জীপে তুমি আমি ছাড়া বাংলা কেউ বুঝবে না। যে গাইড গাড়ি চালাচ্ছে তার সঙ্গে তো সকালে কথা বলেই বুঝেছ বাংলা জানে না। পুরোপুরি রাজস্থানী। আর বাকী যে দুজন সাহেব মেম রয়েছে তাদের তো কোন কথাই নেই, ইংরিজী ছাড়া কিছুই জানে না।

রুমীর জবাব—তাহলে যত খুশী বলে যাও।

ভরতপুর বনের অন্ধকার চিরে জোরাল হেডলাইট জ্বালিয়ে আমাদের জীপ দৌড়চ্ছে। চারধার যাতে খুশীমত দেখা যায় তার জন্য হুড্ খুলে দেওয়া হয়েছে। বনের গভীরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা জীপের খোলা মাথার লোহার ফ্রেম ধরে চলেছি। মাঝে মাঝে দু'চারটে জন্তু-জানোয়ারকে একধার থেকে আর একধারে ছুটে পালাতে দেখছি। যতক্ষণ বনের ভেতর দিনের আলো ছিল ততক্ষণ হরিণের দলকে দেখা গেছে। কিন্তু গভীর বনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হরিণরা কোথায় লুকিয়ে পড়ল কে জানে। তার বদলে বেরিয়ে পড়েছে নীলগাই, বনবেড়াল আর হায়না। একটা হায়না তো জীপের সামনেই এসে পড়ল। ধুরন্ধর গাইড জীপ নিয়ে তাকে তাড়া করল। হায়না যাবে কোথায়! হু হু শব্দে জীপের হেডলাইট তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বেচারা দৌড়োয় আর পেছন ফিরে দ্যাখে। অবশেষে হঠাৎ পাশে একটা জলাঘাসের বাদা পেয়ে সট করে নেমে পড়ল।

বনজঙ্গলের মধ্যে কোনমতে করে' দেওয়া পথ দিয়ে হু হু করে আমাদের জীপ ছুটছে। দু'পাশের নুয়ে পড়া গাছগুলো যেন হঠাৎ হঠাৎ ধরতে চাইছে দ্রুত ধাবমান জীপটাকে। গাড়ি চালাতে চালাতেই গাইড আমাদের বারবার সতর্ক করে দিতে লাগল—মাইণ্ড ইয়োর হেড। বারবার মনে করিয়ে না দিলে গাছের ডালপালার সঙ্গে মাথা ঠুকে ভেঙে যেত। রুমী আর আমি হুড্ খোলা জীপের লোহার ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাতটা সে তখনও ধরে আছে, তবে আগের মত অত জোরে নয়। রুমী কোন্ ফাঁকে আমাদের অপর দুজন সঙ্গী আমেরিকান দম্পতিকে দেখে নিয়েছিল। আমাকে চুপি চুপি বলল—ওরাও হাত ধরাধরি করে বসে আছে।

আমি বললাম—হাত ধরাধরি করাটা আমাদের দেশে যেমন গুপ্ত ব্যাপার বলে মনে করি ওরা কিন্তু তা মনে করে না। আমাদের বন্ধু বন্ধুতে কাঁধ ধরাধরি যেমন, ওদের বন্ধু বান্ধবীতে হাত ধরাধরি তেমনই।

এক একটি দেশের আদবকায়দা এক এক রকম। এই প্রসঙ্গে আমার এক বিখ্যাত লেখক বন্ধুর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অভিজ্ঞতার কথা বললাম। ওর কাছে শুনেছিলাম ওরা যখন সেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছল, ওদের সম্বর্ধনা জানাতে এল ওখানকার আদিবাসী মেয়েরা, প্রত্যেকে খালি গায়ে। এসে ওদের সেই অবস্থায় চুম্বন করে সম্মান জানাল। স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধুটি গিয়েছিল, কি অবস্থা দুজনের! কিন্তু কোন উপায় নেই, যে দেশের যা রীতি।

এক জায়গায় এসে আমাদের গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করল। গাইড বলল—নাউ উই হ্যাভ এনটার্‌ড্ ইনটু দি পাইথন জোন্।

গাইডের কথায় চমকে উঠলাম। বলে কি! অজগর সাপের এলাকায় আমরা ঢুকে পড়েছি! জীপ থেকে গাইড নেমে বলল—আসুন, ময়াল সাপরা নিজের এলাকায় কেমন করে থাকে, দেখবেন আসুন।

রুমী নামবে না, বললে—পাগল নাকি! এই অন্ধকার জঙ্গলে ময়াল সাপের এলাকায় কেউ নামে নাকি?

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—এখানে তুমিই প্রথম এলে না। তোমার আগে এরকম অনেকে এসেছে নেমেছে দেখেছে। শুনি নি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে। আর যদি ভয়ের কিছু থাকত তো গাইড এভাবে নিয়ে আসত না।

আমার কথা শুনে রুমী আর বসে থাকতে পারল না। আমেরিকান সাহেব মেম দুজনে নেমে পড়েছে। রুমী নামল। জীপের জোর আলো পাইথন জোনের বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা চারজন যাত্রী গাইডকে অনুসরণ করলাম। গাইড ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। আমরা দেখছি বিচিত্র আকারের গর্ত, খানা-খন্দ। তার ভেতরে কোথাও লম্বা হয়ে, কোথাও তালগোল পাকিয়ে ময়ালগুলো নিস্পৃহ হয়ে পড়ে আছে। কেউ কেউ মাঝে মাঝে শির্‌শির্ করে নড়ছে। গাছের ডালেও দু' একটা পাকিয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে গা শিউরে উঠতে লাগল, কে জানে যদি একটা ময়াল আচমকা পেঁচিয়ে ধরে। গাইড খুব দক্ষ! ঘুরে ঘুরে আমাদের সব দেখাচ্ছে বটে কিন্তু ওদের কাছে যাচ্ছে না। গাইড বলল—খুব কাছে না যাওয়াই ভাল। দক্ষ শিকারীরা যখন বোঝে জানোয়ার তার দড়ির ফাঁসের আওতায় এসে পড়েছে তখনই 'ল্যাসো' ব্যবহার করে। সেই রকম ময়ালরা, সম্পূর্ণ নিজের আওতায় না এলে পাক দিয়ে ধরে না, ওরা কখনও তেড়ে গিয়ে ধরে না। গাইড আরও বললে—সকালবেলা এদের আরও ভাল দেখা যায়। রোদ পোহাবার জন্যে ওরা তখন মাঠের ওপর বিছিয়ে শুয়ে থাকে।

অনুমান করে শিউরে উঠলাম সকালের দৃশ্য কেমন! রাতের জঙ্গল দেখা শেষ। রেস্ট হাউসের দিকে জীপ ফিরে চলেছে। যেতে যেতে গাইড এক লোমহর্ষক ঘটনা বলছিল—

১৯৬৬ সালে গুজরাটের গির জঙ্গল। মুক্ত সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই জঙ্গলে সিংহ মারা নিষেধ। মানুষরা ওদের দীর্ঘদিন মারে না, কাজেই মানুষদের বিশেষ ভয় নেই। কিন্তু বিপদ ঘটল অন্যদিক দিয়ে। হঠাৎ এক বিরাট অজগর একটা সিংহকে পেঁচিয়ে ধরল। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল দুজনের মধ্যে। তিনদিন চলল সে লড়াই।

গাইড প্রত্যক্ষদর্শী, খুব ভাল লাগছিল প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে ঘটনা শুনতে। পরিণতি জানবার জন্যে আমরা অধৈর্য হয়ে পড়লাম। গাইড খুব রসিয়ে রসিয়ে ধীরে ধীরে ঘটনাটা বলছে। আমাদের আর সবুর সইছে না—শেষটায় কি হল?

গাইড বলল—অবশেষে……

তার কথা শেষ হল না। গাড়ির সামনে এসে পড়ল একটা নীলগাই। একটু সামলে নিয়ে আবার গাড়ি চলল।

আমরা বললাম—অবশেষে কি হল?

গাইড বলল—অবশেষে অজগরটা আস্তে আস্তে সিংহকে গিলে ফেলল। এ দৃশ্য দেখতে দিল্লী বোম্বাই ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে লোকে এসে ছিল।

মারাত্মক ব্যাপার!

রেস্ট হাউসে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডাইরি লিখতে বসলাম। দোতলায় আমাদের ঘরের পাশেই একটা ঘর তালা-চাবি দেওয়া। ভিতরে কি আছে জানি না। সেই ঘরের সামনেই চেয়ার টেবিল পাতা। বারান্দার আলো জ্বেলে বসলাম লিখতে। নিশুতি রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। রুমী সারাদিনের ক্লান্তিতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দা থেকে যতদূর চোখ যায় অরণ্য অন্ধকার। একটুও সাড়াশব্দ নেই। অরণ্যের বাসিন্দারাও কি ঘুমিয়ে পড়ল? না, ঐ তো কিসের ডাক একটা শোনা গেল! কান খাড়া করলাম, হ্যাঁ আবার শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এবার কাতর ডাক। বোধ হয় শেষ আক্ষেপ! একটু পরেই সব চুপচাপ। বেয়ারা, চাকর-বাকর সকলের ঘরে আলো নিভে গেছে। কেবল দোতলার বারান্দায় আমারই আলো জ্বলছে আর জেগে আছি আমি একা। ভরতপুরে দিনটা যেমন সুন্দর ও মুখর, রাতটা তেমনি নিঃসঙ্গ ও সাংঘাতিক!

অনেকক্ষণ হয়ত লিখেছি, হঠাৎ মনে হল সামনের বন্ধ ঘরটায় যেন নানারকম শব্দ হচ্ছে। ডাইরির পাতায় চোখ রেখেই কান সজাগ করে সে শব্দ শুনতে

লাগলাম। শোনার ভুল নয়। ঠিকই শুনেছি। ভেতরে কখনও খস্ খস্ কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ। চোখ তুলতে সাহস হচ্ছে না। চোখ তুললে যদি দেখি দরজায় তালা-চাবি নেই, হাট করে খোলা আর সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে। খস্ খস্ শব্দ তারই কাপড়ের। দীর্ঘনিঃশ্বাস তারই। শুনেছি ডাকবাংলোয় থাকে অনেক কিছু। কি করি কি করি? ওদিকে মাঝে মাঝে শব্দ হয়ে যাচ্ছে ঠিক। কতক্ষণ থাকব এভাবে? একটা কিছু করা দরকার। অবশেষে যা হবার হবে বলে তাকালাম সামনে। ঘরটার দরজায় তেমনি তালা-চাবি ঝুলছে। কেউ কোথাও নেই। ডাইরি বন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। দরজায় কান পাতলাম। হ্যাঁ, ঘরের থেকেই শব্দ আসছে। যতদূর মনে পড়ছে সকালে দেখেছিলাম ঘরের পেছন দিকে কোন প্রবেশপথ নেই। এই বারান্দা দিয়েই সব ঘরে ঢুকতে হবে। তবে ব্যাপার কি? যাক্‌গে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙতে দেখি আবার সেই ঝলমলে ভরতপুর। চারদিকে সবুজ আর সবুজ, পাখির আনন্দ কলকাকলী। কাল রাতের কথা যেন দুঃস্বপ্ন! ব্যাপারটা রুমীকে বলি নি পাছে ভয় পায়। বেড়াতে বেরিয়েই আতঙ্কের মোলাকাৎ যাত্রার আনন্দ পণ্ড করে দেবে। কিন্তু ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসেই রুমী বলল—কালকে রাতে যখনই ঘুম ভেঙেছে পাশের ঘরে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেয়েছি।

—কি রকম শব্দ?

ও বলল—যেন কে চলে বেড়াচ্ছে আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। যতবার তোমায় ডাকব মনে করছি দেখি গাঢ় ঘুমোচ্ছ। সেই জন্যে ডাকতে মায়া হল।

আমার কথা তখন ওকে বললাম। ওই শব্দই তাড়াতাড়ি আমায় ঘরে এসে ঘুমতে বাধ্য করেছে।

চা-খাবার খেয়ে আমাদের প্রথম কাজ হল রাতের এই বন্ধ ঘরের রহস্য জানা। কেয়ারটেকার আমাদের নিয়ে এল বন্ধ দরজার সামনে, তারপর তালা খুলে ঘরটায় ঢুকে জানলাগুলো খুলে দিল। দিনের আলো ঝলমল করে ঘরে ঢুকে পড়ল। বাঃ! চমৎকার ঘরখানা। দামী দামী আসবাবপত্রে সাজান। ঝকঝকে মেঝেয় মূল্যবান কারপেট। জানালা দরজায় পেলমেটে ফুলকাটা ভারি পর্দা ঝুলছে। দেওয়ালে নানারকম জন্তু জানোয়ারের চামড়া। ঘরের কোণেও ত্রিপদের ওপর রাখা আছে ট্যাক্সিডার্মি করা অনেক মরা পাখি ও জানোয়ার। এতক্ষণে রহস্য ভেদ করা গেল। বাতাসে শুকনো চামড়া দেওয়ালে লেগে নানারকম শব্দ হয় আর জন্তু জানোয়ারদের খুলির ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে গিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শোনায়।

কেয়ারটেকার বলল—রেস্ট হাউসের কমনরুম এটা। ইচ্ছে করলে মাঝে মাঝে এখানে এসে বসতে পারেন।

হেসে রুমীকে বললাম—ঘরটা তাহলে খোলা থাক, কি বল?

রুমী তাড়াতাড়ি বলল—না!

ভরতপুর রেস্ট হাউসের নাম 'শান্তি কুটির'। শান্তি এর চারিদিকে। রেস্ট হাউসের সামনের দিকে ওয়াইল্ড্ লাইফ স্যাংচুয়ারি—বন্য প্রাণীর সংরক্ষিত জঙ্গল। বনে নানা রকম জন্তুজানোয়ারের ছড়াছড়ি। বিকেলে রেস্ট হাউসের বাঁদিকে খোলা জায়গাটায় রোজ অনেকগুলো হরিণ এসে ভিড় করে। স্পটেড হরিণই আসে দেখি। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখি দু-একটা কৃষ্ণসার হরিণ বা এ্যানটিলোপকে। সবাই ওই খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে আর বোবার মত তাকিয়ে থাকে আমাদের রেস্ট হাউসের দিকে। কি করুণ আর সরল চোখ। শিকারীরা কি করে যে হরিণ মারে! ওদের একটু মায়া হয় না? সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, তাই আমরা আর বিকেলে বেরোতাম না। এটা রুমীর ব্যবস্থা। ও বলেছে বিকেলে বারান্দায় বসে হরিণ দেখব। ভাল কথা। কখনও কখনও যে দিন আমাদের একটু ফিরতে দেরি হয় সেদিন রুমী পথের মধ্যে আমাকে তাড়া দেয়—পা চালাও তাড়াতাড়ি। এতক্ষণে হরিণেরা এসে গেছে। এক এক দিন সকালবেলা আমরা বাজি ধরি বিকেলে ক'টা হরিণ আসবে।

ওয়াইলড্ লাইফ স্যাংচুয়ারি—স্বাধীন পশুদের মুক্ত আস্তানা, আর পেছনের দিকে মুক্ত পাখিদের বিরাট এলাকা। মাইলের পর মাইল জলা জায়গা। বিরাট জলার যে দিকে চোখ যায়, ছোট, মাঝারি নানা আকারের গাছ আর লম্বা লম্বা ঘাস জলার ওপর জেগে আছে। তবে কাঁটাময় বাবলা গাছের সংখ্যাই বেশী। প্রথম নজরে গাছগুলোকে মনে হবে পাতাবাহারি কিন্তু নৌকো করে যত কাছে যাওয়া যাবে দেখা যাবে গাছগুলো মোটেই পাতাবাহারি নয়, নানা রঙের পাখিরা ওদের পাতাবাহারি করে তুলেছে। রুমী এই ভুলটা প্রথমে করেছিল। আমরা যখন বার্ডস্যাংচুয়ারি দেখতে গেলাম তখন দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। জনা চারেক লোক ধরে এমন একটা ছোট নৌকোতে আমাদের নিয়ে রেস্ট হাউসেরই মাইনে করা মাঝি লগি ঠেলে ঠেলে জলার ঘাস আর শাপলা ফুলের মেলার ওপর দিয়ে চলল। আমাদের নৌকোটা সুন্দর যাচ্ছে। ছোট্ট নৌকো। জল বেশী নেই, ফুট তিনেক হবে।

আস্তে আস্তে দিনের আলোয় সারা ঝিল পরিষ্কার হয়ে এল। এতক্ষণ পাখিরা গাছে পাতার মত নিশ্চল হয়ে বসেছিল। এবার নড়াচড়া শুরু করল। তাদের কলতানে সমস্ত ঝিল মুখর হয়ে উঠল। বছরের সকল সময়ে এত পাখি থাকে না। রাজস্থানে বৃষ্টি নামে জুলাই আগস্ট মাসে। সেই সময়ে

পাখিগুলো আসতে শুরু করে। পৃথিবীর বহু দূর দূর জায়গা থেকে ওরা চলে আসে। আসে ওরা সাইবেরিয়া, আলাস্কা, মঙ্গোলিয়া, কাজাকিস্থান, লাদাক, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে। ওরা এসে সামান্য কয়েক মাসের জন্যে বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, ছানাদের বড় করে। এরপর আবার চলে যায় কে কোথায় কে জানে? এরা সব যাযাবর পাখি। সারা জীবন ধরে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যখন এদের অনুকূলে মরশুম শেষ হয়ে যায় সেখান ছেড়ে এরা চলে যায় আবার সেখানে যেখানে আবার কিছুকাল বাস করতে পারবে। কেবল থেকে যায় ভারতীয় পাখিরা। সারা বছরই ওই পাখিগুলো থাকে। নবাগত পাখিদের বেশ মানিয়ে নিয়েছে এই সব ভারতীয় পাখিরা। কোনদিন বিবাদবিসম্বাদের খবর পাওয়া যায় না। এরা বলে তোমরা তোমাদের মত থাকো, আমরা আমাদের মত থাকি। পাখিরা রাজনীতি বা পার্টিবাজি করতে শেখে নি বলে বেশ শান্তিতে থাকতে পারে, নয়তো যে যার মত কি থাকতে পারত?

পাখিদের গা ঘেঁষে ঘেঁষে আমাদের ছোট নৌকোটা চলেছে। কেউ উড়ে পালাচ্ছে, কেউ বা একটু নড়ে চড়ে পাশে সরে যাচ্ছে। মজা হচ্ছে যখন ডিম পেড়েছে এমন আস্তানার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ডিম ফুটে কয়েকদিন হল যে বাচ্চাগুলো বেরিয়েছে তারা আমাদের উপস্থিতি জানতে পেরে অদ্ভুত সব শব্দ করে ঘেঁষে ঘেঁষে এক জায়গায় গিয়ে জড় হচ্ছে।

রেস্ট হাউসে যখন ফিরে এলাম তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে আমরা ব্রেক্‌ফাস্ট করতে গেলাম।

রুমীর বেজায় ভাল লেগেছে শান্তি কুটিরকে যতক্ষণ সূর্য পশ্চিমে ঢলে না পড়ে ততক্ষণ নানারকম পাখির আনাগোনা আর কলতান। তারপর হরিণদের হাজিরা আর সন্ধ্যের পর রাতের অন্ধকারে যখন চারিদিক মুছে যায় তখন সারারাতের জন্যে গভির নিস্তব্ধতা! দিনরাত সকল সময়ে এখানে কেবল শান্তি শান্তি!

অন্ধকারে দৃষ্টি উধাও করে রুমী বারান্দায় গোল বেতের চেয়ারে ছড়িয়ে বসেছিল। এক সময়ে সে বলল—গাইডবুকে দেখেছিলাম ভরতপুরের এই রেস্ট হাউসেরই নাম শান্তি কুটির। এখন দেখছি নামটা সার্থক।

কিন্তু এহেন শান্তি কুটিরকেও একদিন ছেড়ে যেতে হল। সামনে ডাকছে বিস্তীর্ণ রাজপুতানা। এক জায়গায় বেশীদিন থাকবার সময় কোথায়?

এবারে চললাম আলোয়ার। মাঝ পথে পড়ে 'দীগ' বলে একটা জায়গা। রাজস্থানের ইতিহাসে এর গুরুত্ব কম নয়। আলোয়ারগামী বাসে আমরা চড়ে বসলাম। রুমীকে বললাম—আমরা দীগে কিছু সময়ের জন্যে নামব।

রুমীর তখন কিছুই ভাল লাগছে না। বললে—আমাকে শান্তি কুটির টানছে।

টানুক ওকে শান্তি কুটির। ওকে আর আমি বিরক্ত করলাম না। বাস ছুটছে। রাস্তাঘাট, মাঠ, গাছপালা সব কিছুই বড় অদ্ভুত লাগছে। কয়েক শ' বছর আগেকার ছবি মনের পর্দায় ফুটে উঠছে। এখন যেমন রাজপুত মেয়েরা ঘড়ার ওপর ঘড়া সাজিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে তখনও নিশ্চয়ই এরকম যেত, তবে তখন যেখানে সেখানে মাঠের ওপর নিশ্চয়ই ওদের বাড়ি ছিল না বা অরক্ষিত অবস্থায় মেয়েদের যাতায়াতের রেওয়াজ ছিল না। জনপদগুলো থাকত কেল্লার প্রায় সঙ্গে অথবা কেল্লার বিশাল প্রাকারের বেষ্টনের মধ্যে। ভাবতে বেশ ভাল লাগে রাজপুতরা ঘোড়ায় চড়ে মাথায় বিরাট বিরাট পাগড়ি বেঁধে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে গোঁফে তা দিয়ে এই পথে কত যাতায়াত করেছে। এই সব রাস্তায় কত ব্যস্ত থাকত তারা। আর যখন যুদ্ধ বাধত তখন তো কথাই নেই। রাস্তায় অনর্গল দেখা যাচ্ছে পুরো একটি থানের বিরাট পাগড়ি বাঁধা জাটরা কোমরে লম্বা লম্বা তলোয়ার ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সর্বদা ব্যস্ত হয়ে নানা জায়গায় ছোটাছুটি করছে—নানা কাজে। হাতিরা কতরকমের মালপত্র টেনে নিয়ে যাচ্ছে—কখনও রসদের পাহাড়, কখনও অস্ত্র-শস্ত্রের স্তুপ, কখন বা কামান। কিন্তু এখন রাস্তাঘাট কত শান্ত!

দীগ্ এসে গেল। রুমী এখনও কিসের চিন্তায় মগ্ন। বোধ হয় শান্তি কুটিরের।

বললাম—রুমী দেবী, আপনি এখন কোথায়?

রুমীর চমক ভাঙল। বলল—আমরা কোথায় এলাম?

বললাম—নামো, দীগে এসে গেছি।

দীগের স্থান ভরতপুরের পরই। জাট রাজা জহর সিং এখনকার দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান। জহর সিং ও সূরযমল একই বংশের। দীগের কেল্লা এখনও বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় অক্ষত, কিন্তু ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায় এ মনে হওয়া ঠিক নয়। ভেতরের সব কিছুই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কেল্লার সামনে আছে গোপালবাগ। মনোরম একটি বাগান। নাড়ুগোপালের নামে এ বাগানের নাম। প্রাসাদের প্রধান অংশের নাম গোপালভবন। এখানে আছে নাতিবৃহৎ একটি চন্দন কাঠের নাড়ুগোপালের সুন্দর মূর্তি। জহর সিংয়ের পরিকল্পনা ও রুচির তারিফ করতেই হয়।

রুমী বলল—জহর সিং খুব রসিক লোক ছিল, সেই সঙ্গে তার মনটিও ছিল ছেলেমানুষের।

বললাম—কেন বল তো?

দু'চোখে বিস্ময় এনে রুমী বলল—দেখছ না যেখানকার যত টুকিটাকি

জিনিস, যাকে বলা যায় কিউরিও, সব এনে হাজির করেছে এইখানে। এদিকে দিল্লী থেকে লুঠ করে আনা কষ্টিপাথরের বাথটাব, ওদিকে অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে লুঠ করে আনা শ্বেতপাথরের দোলনা, ইটালিয় মার্বল্-পাথরের থেকে অতিসূক্ষ্ম লতাপাতাওলা ফুলগাছ, আরও কত কি?

রুমীকে জিজ্ঞাসা করলাম—বল তো, ওই শ্বেতপাথরের দোলনা আর কষ্টিপাথরের বাথ্টাব, মনে করা যাক যে কোন একটা তোমাকে নেবার স্বাধীনতা দেওয়া হল, তুমি কোন্টা নেবে?

রুমী বলল—বাথটাব্টা। দেখছি তাই, নয়তো এমন বাথটাব্ কখনও কল্পনা করা যায় না। তিন ফুট চওড়া এবং সাত ফুট লম্বা। মাথার ওপর দিকে পালঙ্কের মত সুন্দর ভাবে উঁচু করা। এই জিনিসটি দেখে আমি তো প্রথমে মনে করেছিলাম আর এক রকমের সিংহাসন।

কিছু একটা শোনার আশায় রুমী আমার দিকে তাকাল। আমাকে মৃদু মৃদু হাসতে দেখে সে বলল—হাসছ কেন? আমি কি কিছু ভুল বলেছি?

এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল—কই বলো?

হাসতে হাসতেই বললাম—না, তোমার আগের ধারণাটাই ঠিক ছিল। ওটা সিংহাসনই।

রুমী অবাক হয়ে বলল—সিংহাসন? কিন্তু লেখা রয়েছে যে বাথ্টাব?

বললাম—বাথ্টাব কি শোবার সিংহাসন নয়? তোমার কি মনে হয়?

আমার কথাতে রুমী খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

গোপালভবন ঘুরতে ঘুরতে একপাশে শ্বেতপাথরের একটি নর্তকীর মূর্তির সামনে রুমী দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর চোখের পলক পড়ে না। চোখের পলক না পড়বারই কথা। শ্বেতপাথরের মূর্তিটি যদি প্রমাণ সাইজের হত তাহলে মনে হত একটি জ্যান্ত মানুষ। একটু আগেও হয়তো নড়ছিল, আবারও হয়তো নড়বে। নর্তকীর মূর্তি হলেও মোটেই সে নাচের ভঙ্গিতে নেই—ইংলণ্ডের নর্তকী মধ্যযুগীয় ঘাগরার বিস্তীর্ণ ঝালর মাটিতে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব মোহময়ী মূর্তি। যেন একটি জীবন্ত মানুষ।

রুমীকে বললাম—এ কে জান? এ একজন ইংলণ্ডের নর্তকী। দিশী নাচে জাটরাজাদের অরুচি ধরলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে বিলিতি নাচ দেখাতে একে আনা হয়েছিল ইংলণ্ড থেকে। কিন্তু একদিন জহর সিং দেখলেন নীলনয়নী নর্তকীর জন্যে কবে তিনি হৃদয়ের সবটুকু হারিয়ে বসে আছেন তা টের পান নি। প্রেমে যারা দিনে দিনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তারা কোনদিন কি টের পায়?

রুমী আগ্রহ নিয়ে বলল—তারপর?

—তারপর? বিদেশিনীকে করা হল না বিয়ে। বদলে তার তৈরি করিয়ে

রাখলেন অবিকল একটি মর্মর মূর্তি। ইটালির একজন সেরা ভাস্করকে আনিয়ে করালেন এই অপূর্ব মূর্তি, যেন পাথরের ফটোগ্রাফ।

আমার কথা শুনে রুমীর চোখ বড় বড় হয়ে উঠছে। সে বলল—তাতেই রাজার শান্তি হল ?

বললাম—কে জানে !

রুমী করুণ ভাবে বলল—কিন্তু ওদের বিয়েটা হল নাই বা কেন ?

বললাম—শুনেছিলাম নর্তকীটি নাকি হঠাৎ মারা যায়।

রুমীর মুখ দিয়ে মেয়েদের চিরকালীন সহানুভূতিসূচক ধ্বনি বেরিয়ে এল—আহা রে !

বললাম—সত্যি দুঃখের কথা। বেচারা জহর সিং বাকী জীবনটা ঐ মূর্তির দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিলেন। অন্দরমহলে রানী রাজাকে না পাওয়ার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন আর নর্তকীকে না পাওয়ার দুঃখে রাজা নিজের কক্ষে বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। দীগের গোপালবাগে নানা আনন্দের মধ্যে আছে ঐটুকু দুঃখের ইতিহাস। হয়তো সেই জন্যেই দীগকে আরও ভাল লাগবে।

গোপালভবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জলের ওপরে তিনতলা আর জলের নীচে দোতলা। স্থাপত্যের এ এক বিস্ময়! জলের নীচে দোতলা করা হয়েছিল যাতে গরমকালে সেখানে বাস করা যায়।

রাজপুত এবং জাটরাজারা যেমন বিলাসী ছিলেন তেমনি শক্তিচর্চার দিকেও ছিল তাঁদের মন। গোপালভবনের পাশেই আছে নন্দ (আনন্দ ?) ভবন নামে একটি বিরাট হল ঘর। সেখানে রাজারা এবং রাজপুত্ররা মাটি মেখে কুস্তি করতেন। গদা যুদ্ধ চলত। যেখানে শক্তিচর্চা হয় সেখানেই শক্তির প্রতীক হনুমানজীর মূর্তি রাখা হয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। নন্দভবনে একটু দূরেই মহাবীর হনুমানের বিশাল মূর্তিসমৃদ্ধ মন্দির রয়েছে। মল্লযোদ্ধা রাজারা কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে কিন্তু আজও গোপালবাগে সকাল সন্ধ্যেয় মহাবীরের পূজো হয়। আমাদের প্রসাদ দিতে দিতে পুরোহিত রাজাদের অনেক কথাই বলছিলেন। পুরোহিত বলছিলেন—ধর্ম মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। বেঁচে থাকার ধর্মই হল ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখা এবং এর অনুশাসনকে মেনে চলা। যাদের কাছে বাঁচা অর্থহীন তারা সাধারণতঃ নাস্তিক হয়। জীবনের অবলম্বন খুঁজে না পেলে মানুষের মনে জমে হতাশা, ভয়, যার থেকে জন্ম নেয় নৈরাশ্যবাদ। পুরোহিত মন্দিরে বসে বসে বলছিলেন যে, নৈরাশ্য মানুষের সব থেকে বড় শত্রু। মানুষ ভগবানকে মানুক বা না মানুক এটা তাকে স্বীকার করতে হবে যে সুস্থ সজীব হয়ে টিঁকে থাকতে গেলে অস্তিবাদই তাকে সঞ্জীবনী দেবে, নাস্তিবাদ নয়। পুরোহিত আরও

বলছিলেন যে, বর্তমান সমাজ হয়ে পড়েছে ভোগসর্বস্ব। যে মানুষগুলো হয়েছে ভোগের দাস তারা নাস্তিবাদী, তারা বিশ্বাস করে না ভগবান বলে কিছু আছে, পরকাল বলে কিছু আছে। তারা কেবল জানে এই জগৎটাই সব, এই স্থূল দেহটাই সব। এই দেহ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর শেষ। পরকাল আবার কি? আত্মা বলে কিছু নেই। অতএব বেঁচে থাকতে থাকতে যা পার লুটে-পুটে খাও, যেন তেন প্রকারেণ ভোগ করে নাও। সুখ করে নাও। কিন্তু তার পরিণাম কি হচ্ছে? পরিণাম হচ্ছে সে নিজেও কষ্ট পাচ্ছে আর যে বা যারা তার চক্রে থাকছে সেও কষ্ট পাচ্ছে। সুখ সুখ করে সুখের সন্ধানে ছুটে ব্যর্থ হয়ে পরিণাম করে তুলেছে ভয়াবহ। কিন্তু যারা ভগবদ্‌বিশ্বাসী তারা অনেক বেশী সুখী। তারা বিশ্বাস করে ওপরওলা একজন আছেন, যাঁর ওপর সর্বস্ব নির্ভর করা যায়। আমার সাধ্যের বাইরে কিছু থাকলে তিনি দেবেন সেই ক্ষমতা যার দ্বারা তাকে সাধ্যের আওতায় আনতে পারা যাবে। সেই পরম ক্ষমতাবান ওপরওলাই সব দেখবেন। এই যে নির্ভরতা, বিশ্বাস থেকেই তার জন্ম। বিশ্বাস মানুষকে দেয় অনেক কিছু। সদ্‌বিশ্বাস আত্মোন্নতির প্রেরণা দেয়।

পুরোহিত সুন্দরভাবে বলছিলেন কথাগুলো। ভাল লাগছিল পুরোহিতের কথা শুনতে। ছেলেবেলা থেকে আমি একটু ধর্মে কর্মে বিশ্বাসী। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছি বাড়িতে পূজোপার্বণ, অতিথি সেবা, ধর্ম-পুস্তক পাঠ, কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত, ন্যায় অন্যায়ের ভেদ নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি। কাজেই আমার মন আস্তিক হয়েই গড়ে উঠেছিল। রুমীরও দেখি পুরোহিতের কথা বেশ মনে ধরেছে। রুমী আমাকে বলল—আশ্চর্য! আমাদের বাংলাদেশের পুরোতদের মতই এনার তত্ত্ব কথা।

—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সব ধর্মের মূল এক। আমি বললাম—আমাদের ভারতীয় ধর্মকথাই এই, সেখানে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের কোন তফাৎ নেই। প্রকৃত জ্ঞানী পুরোতরা সর্বত্রই এক।

আমাদের দীগের গোপালবাগ দেখা শেষ। ফিরে আসছি। এমন সময়ে ছোট ছোট তিনটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—গাইড লেনা বাবুজী?

বললাম—তিনজন গাইড?

তিনজনই গাইড নয়। ওদের মধ্যে একজনই গাইড। বাকী দু'জন ওর সঙ্গী। ছোট ছোট ছেলে, কাজেই ওরা একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে ছেলেটাকে গাইড বলে সঙ্গী দেখিয়ে দিল সে বেশ ফুটফুটে। বছর বারো তেরো হবে। এটুকু ছেলে গাইড হয়ে সব বলবে?

আমি বললাম—তুমি এত ছোট ছেলে। আমাদের সব দেখাতে বোঝাতে পারবে?

ছেলেটি জবাব দেবার আগেই ওর সঙ্গী দুজন কল্‌কল্‌ স্বরে বলে উঠল—সাকেগা বাবুজী, সাকেগা।

ওদের প্রচণ্ড আগ্রহ। নিরস্ত করা কি ঠিক হবে? আমার বেশ মজা লাগল। বললাম—কি করে সাকেগা?

ছেলেটি বলল—আমি ঠিক পারব। আমি দু'সাল ধরে এই কাজ করছি। ইস্কুলের ছাত্র। এই কাজ করে যে পয়সা পাই জমিয়ে রাখি। ইস্কুলে পড়ব।

জিজ্ঞাসা করলাম—এই যে বললে ইস্কুলের ছাত্র, আবার ইস্কুলে পড়ব বলছ কেন? এখন ইস্কুলে পড় না?

ছেলেটার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। ওর একজন সঙ্গী জবাব দিল—মাইনে দিতে পারে না বলে ইস্কুল থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওকে বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে ওর মা। ইস্কুল থেকে নাম কেটে দিয়েছে জানতে পেরে ওর মা ওকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছ্যাখ না বাবুজী, ওর মা লকড়ি ছুঁড়ে মেরেছিল, গালের ঘা এখনও শুকোয় নি।

এই বলে ছেলেটার গালে একটা ক্ষত দেখাল। দারিদ্র্যের চেহারা সর্বত্রই এক। সুখ ভোগের পদ্ধতির হয়তো রকমফের আছে। কিন্তু দারিদ্র্যের চেহারা এবং তাতে তিলে তিলে পোড়ার কোন রকমফের নেই। যে ছেলে মাইনে দিতে না পারার জন্যে তাড়া খেয়ে ইস্কুলের বাইরে চলে এল, দোষটা কি সেই ছেলেটার, না অভিভাবকের, যে পারল না ওই দুধের বাছাটাকে ইস্কুলের সামান্যতম বিদ্যা দিতে, তার বদলে করল প্রহার? মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। দুধের বাছাকে যে মারল সে মা। হোক না সে বাংলাদেশের মা নয়, কিন্তু মা-ই তো। বিশ্বব্যাপী মায়ের চেহারা একই, সন্তানের গায়ে একটি আঁচড়ের বিনিময়ে নিজে নিতে পারে শত আঁচড়। ছেলেটাকে লকড়ি ছুঁড়ে মেরেছে মানে সে কি ছেলের ওপর রাগ করে মেরেছে? মেরেছে চরম দারিদ্র্যের ওপর ঘৃণায়, লজ্জায়। ওইটুকু একটি ছেলেকে সামান্য কয়েকটা টাকার অভাবে ইস্কুলে পড়াতে পারল না, হয়তো ওরই পাশের বাড়ির ছোট ছেলেগুলো, যারা ওর বন্ধু, কেমন বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে, এ কি কম দুঃখের কথা! আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ছেলেটাকে লকড়ি ছুঁড়ে মারার পর মায়ের কি বুক ভাঙা কান্না!

আমাদের গোপালবাগ দেখা হয়ে গিয়েছিল। দীগে দেখবার আর কিছু নেই। কিন্তু ছেলেটার করুণ কাহিনী শুনে আর ছলছল চোখ দেখে রুমী বলল—তা হোক, ও না হয় আর একবার গোপালবাগ দেখাক, তারপর ওকে দু-তিনটে টাকা দিয়ে দিও।

কুমীর এই গুণটা বড় ভাল লাগে। এই ভাবে ও অনেক অভাবগ্রস্ত লোকেদের সাহায্য করে। ওর ভেতর দিয়ে আমার অনেক অবচেতন সাধ পূর্ণ হয়। কাজেই ওর পরামর্শ আমার ভালই লাগল। আর একবার ছেলেটার সঙ্গে গোপালবাগ দেখে ওর হাতে গোটা দুয়েক টাকা দিয়ে দিলাম। সে বেজায় খুশী হয়ে গেল। টাকা দুটো নিতে নিতে সে বলল যে বড় হয়ে গভর্নমেন্ট ট্যুরিস্ট গাইড হবে। আরও ভাল করে সে বোঝাতে শিখবে।

আলোয়ারের ইতিহাসকে রসঘন করেছে 'শিলিশেঠ'-এর কাহিনী। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বিকেল। পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বেনী সিং-এর বংশের তৃতীয় পুরুষ মঙ্গল সিং। মৃগয়ায় বেরিয়ে জল-পিপাসায় কাতর হয়ে অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেলেন একটি ছোট বাড়ি। বাড়িটার কাছে মঙ্গল সিং এসে হাজির হলেন। দ্বার রুদ্ধ। অনেক হাঁক-ডাকেও খুলল না সেই দরজা। অথচ বোঝা যাচ্ছে বাড়ির ভেতর লোক আছে। মঙ্গল সিং তখন ব্যাপার কি দেখবার জন্যে বাড়ির সংলগ্ন পাহাড়টিতে ঘোড়ায় করে উঠে যা দেখলেন তাতে তাঁর মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি দেখলেন একটি কিশোরী মেয়ে পড়ন্ত রোদে চুল ছড়িয়ে শুকোচ্ছে। সেই খালি বাড়িতে আর কেউ কোথাও আছে বলে মনে হল না। মঙ্গল সিং ঠিক করলেন ঐ কিশোরীর কাছেই জল খাবেন। পাহাড় থেকে প্রাকার ডিঙিয়ে তিনি এসে হাজির হলেন বাড়ির মধ্যে। সেই কুমারীর সামনে।

চমকে উঠল কুমারী—কে ?

মঙ্গল সিং বললেন—আমি এখানকার রাজা মঙ্গল সিং। জল খাওয়াও।

কুমারী আনন্দে বিস্ময়ে ভয়ে অবাক। স্বয়ং রাজা মঙ্গল সিং তাদের মত সামান্য ভিলের ঘরে জল খেতে এসেছেন! কি ভাবে রাজার যোগ্য মর্যাদা সে দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে দারুণ এক ভয়ে সে আড়ষ্ট হল।

রাজাকে বলল—আপনি এ কী করলেন, একটি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করেছেন!

মঙ্গল সিং অবাক্ হয়ে বললেন—কি করেছি ?

কুমারী বলল—আমি কুমারী, একা রয়েছি। আপনি স্বাভাবিক রীতিতে এ বাড়ি ঢোকেন নি, চুরি করে ঢুকেছেন।

মঙ্গল সিং-এর চোখ এক লহমার জন্যে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল—বটে। আমি রাজা, তোমরা সবাই আমার প্রজা। আমি চুরি করে ঢুকেছি ?

কুমারী বলল—প্রজাদের সামাজিক রীতিনীতি রাজার জানা উচিত। যাই হোক, জল দিচ্ছি, খেয়ে আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। আমার বাবা এবং ভাই শিকার থেকে এখনি ফিরবে। ওরা দেখলে অনর্থ হবে।

রাজা মঙ্গল সিং জল পান করে চলে যাবার জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু ঐ যাঃ! কুমারীর বাবা ও ভাই যে এসে গেল। রাজা মঙ্গল সিং শুনতে পেলেন পেছন থেকে বজ্রনির্ঘোষ স্বর—দাঁড়ান রাজা, চলে যাবেন না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজা দেখলেন একজন বৃদ্ধ এবং একজন যুবক তাঁর দিকে তীর ধনুক উঁচিয়ে ঐ নির্দেশ দিল।

মঙ্গল সিং বললেন—ওহে, তোমরা আমাকে চেন?

বৃদ্ধর জবাব—বিলক্ষণ, আপনি আমাদের রাজা মঙ্গল সিং।

রাজার সদম্ভ আদেশ—তবে পথ ছাড়।

—না! আপনি রাজা। কিন্তু আমরা গরিব ভিল হলেও আমাদের ইজ্জত আছে। সে ইজ্জত রক্ষা করতে আমরা যে কোন মূল্য দিয়ে থাকি।

রাজার ক্রুদ্ধস্বর—হে বৃদ্ধ, হে যুবক, তোমাদের বক্তব্য কি?

বৃদ্ধের দৃঢ় জবাব—আপনি রাজপুতদের সামাজিক নিয়ম ভেঙেছেন। আমাদের অনুপস্থিতিতে কুমারী কন্যার কাছে বাঁকা পথে এসেছেন। সে যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন! কাজেই নিয়ম অনুযায়ী কন্যার কুমারীত্ব ঘোচানর দায়িত্ব আপনার। এ কন্যাকে আপনার বিবাহ করতে হবে।

রাজার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। রাজা বললেন—সে কি করে হয়? আমাদের রাজবংশের নিয়ম অনুসারে রাজবংশের সঙ্গেই বিয়ে হয়। ভিলের কন্যা কেমন করে বিয়ে করি?

তীর ধনুক রাজার দিকে উঁচু করাই ছিল। তাতে টঙ্কার দিয়ে যুবক বলল—আমরা রাজপুত। আমরা জানি ইজ্জতকে রক্ষা করতে। তবে প্রস্তুত হন রাজা যুদ্ধ করবার জন্য।

রাজা প্রস্তুত হলেন।

তিনজনের অল্পক্ষণ স্থায়ী এক ভীষণ যুদ্ধ হল। পিতা-পুত্রের কাছে হেরে গেলেন রাজা মঙ্গল সিং। পরাজিত রাজা ভিল-কন্যার পানিগ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

কন্যার নাম শিলি। বিয়ে তো হয়ে গেল। এবার শিলির স্বামীগৃহে যাবার পালা। স্বামী বললেন—এসো আমার সঙ্গে।

শিলি কিন্তু আপত্তি জানাল। না, স্বামীগৃহে যেতে নয়। রাজপ্রাসাদে যেতে। শিলি জানাল, সে একমাত্র আদরের কন্যা। তাকে ছেড়ে বাবা ভাই বেশীদিন কাটাতে পারবে না। কাজেই তাকে দেখতে প্রায়ই তারা যাবে। কিন্তু রাজপ্রাসাদে ঢুকতে গেলে অনেক নিয়ম-কানুন। যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা না থাকায় তার ভাই বাবা অনেক অসুবিধেয় পড়তে পারে। তা ছাড়া ভীল বলে রাজপ্রাসাদে তারা যথেষ্ট সম্মান নাও পেতে পারে। এমন অবস্থায় সে

রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে যেতে চায় না। যে অরণ্যে সে এতবড় হয়েছে সেই অরণ্যেই তার থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

তাই হল। রাজা মঙ্গল সিং সেই অরণ্যেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কাটালেন এক সুন্দর হ্রদ। আর তার ধারেই তৈরি করালেন এক রম্য অট্টালিকা। অদূরে স্থাপিত হলেন শেঠ দেবী (শীতলা দেবী ?)। এখন এই জায়গাটার নাম 'শিলিশেঠ' বা 'শিলিশের'। আলোয়ার শহর থেকে মাইল বারো দূরে।

সুন্দর জায়গা আলোয়ার। চারদিক পাহাড়ে ঘেরা। একটি বর্ধিষ্ণু শহর। শহরে চওড়া রাস্তা। প্রচুর মাঠ-ময়দান, অনেকগুলো স্কুল কলেজ। পাহাড়ের ওপর আলোয়ারের ত্রিকোণাকার দুর্গ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এখন সেটি পরিত্যক্ত। যে পাহাড়ে কেল্লা আছে তার কোলে একটি মনোরম চারকোণা সরোবর আছে, সেই সরোবরের চারিদিকে রাজপ্রাসাদটি দেখবার মত।

গোপালজী সেইনির সঙ্গে এখানেই আলাপ। জায়গা পেয়েছিলাম একটা ডাকবাংলোয়। আলোয়ার রেল স্টেশনের ধারেই বড় রাস্তার ওপর ফুল-বাগান লনওলা সুন্দর ডাকবাংলো। ডাকবাংলোর সব ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল, কিন্তু একটি জিনিস বড মন্দ। সেটি আমি লক্ষ্য করি নি। রুমী এসে বলল। বাথরুমের দরজা জানলায় প্রচুর ছেঁদা। নিচের দিকে জানালার কাঁচে সাদা রং চেঁচে চেঁচে তুলে ফেলা হয়েছে, এবং কাঠের দরজায় নানা জায়গায় ছেঁদা। এসব যে ইচ্ছাকৃত সহজেই বোঝা যায়। উদ্দেশ্য বুঝতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। এসব ব্যাপার অসভ্য-চাকরবাকরদের, সেটুকু বুঝি। এটা ওদের একঘেঁয়ে জীবনে সিনেমা দেখার মতই প্রমোদ।

গোপালজীর সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। গোপালজী আলোয়ারের একজন মাননীয় লোক, সবাই এঁকে মানে। আমরা কলকাতা থেকে এসেছি জেনে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গেছেন। এ সব অঞ্চলের লোকের এখনও কলকাতার নামে বিস্ময় জাগে। আমার কাছে বাথরুমের ব্যাপার শুনে গোপালজী ভ্রূ কুঁচকে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। বললেন—নাঃ, এ একদম শরমের কথা। বেল্লিকরা কত লোকের শরমের কারণ হয়েছে কে জানে। আদমিদের আব্রু নিয়ে ওদের এই বেয়াদবি আমি সহ্য করব না। দেখছি কি করা যায়।

এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল এক বিশ্রী ব্যাপার। সব বাথরুমের দরজা জানালাগুলোর এক অবস্থা করে রেখেছে! কিন্তু আমাদের অভিযোগ জানাতে পারি যার কাছে এমন লোক ওখানে কেউ নেই। যারা রয়েছে সব চাকর-বাকর। অগত্যা গোপালজী একটা লম্বা অভিযোগ পত্র

লিখলেন। বললেন এটা আমি এ বাংলোর অফিসে নিজে গিয়ে জমা দিয়ে দেব। দেখবেন কি অ্যাকৃশান নেওয়া হয়।

আমি বললাম—আমরা অ্যাকৃশান কি হয় দেখে যেতে পারব না। কারণ এখানকার মায়া আমাদের দু' একদিনের মধ্যেই কাটাতে হবে। তবে ভবিষ্যতে অন্যদের আব্রু আপনার চেষ্টায় রক্ষা পাবে এ ভরসা রাখতে পারি।

আরও কিছু সময় একথা সেকথার পর গোপালজী বিদায় নিলেন। যাবার সময়ে ওঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

নিমন্ত্রণ রক্ষার বেলায় রুমী এক কথায় রাজী। এসব ব্যাপারে ও বরাবর আমাকে খুব সহায়তা করে। নিমন্ত্রণে যাওয়ার মানে কেবল খাওয়া তো নয়। কি রীতিতে খাওয়ায়, খাদ্য-সামগ্রীই বা কি, এ সব জানবার জিনিস, দেখবার জিনিস। দেশ দেখার অর্থ এই নয় যে কিছু নদী নালা পাহাড় আর অট্টালিকা দেখে এলাম। আমি জানি বেড়াতে ভালবাসে, সুযোগ পেলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে এমন মেয়ে-পুরুষের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা যখন বেড়িয়ে ফেরে তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেমন বেড়ালে, কেমন দেশ দেখলে, তারা বলে বেশ বেড়ালাম। ভারি সুন্দর জায়গাটা। এর বেশী কিছু তারা বলতে পারে না; বলবার নেইও। একটা ছবি দেয়ালে টাঙান আছে সবাই দেখছে, বলছে বাঃ, কিন্তু কেউ কেউ ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আর নড়ছে না। কারণ কি? কারণ হল সে আর পাঁচজনের মত ছবিটার রৈখিক বন্ধন দেখছে না। ছবির বাইরে সে আরও অনেক কিছু দেখছে যা ছবিতে আপাতঃদৃষ্টিতে ধরা পড়ে এমনভাবে বলা নেই। অবনীন্দ্রনাথের কথায় একে বলা যায় 'ছবির দেখা'। দেখার চোখ সকলের আছে কিন্তু 'ছবি দেখা'র চোখ ক'জনের থাকে? দেশকে দেখা গভীর হয় যদি সে দেশের সমাজ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার জানতে পারি।

গোপালজীর বাড়ি আমরা যথা সময়েই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে হাজির হলাম। গোপালজী হাসি মুখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। দেখলাম গোপালজীরা সম্পন্ন চাষী। অগোছান—বিরাট বাড়ি। ঘর অনেক। ঘরগুলো দেখাতে লাগলেন আমাদের—কোন ঘরে মক্কা বোঝাই, কোনটায় গবাদি পশুর খাদ্য জমা করা আছে, কোন ঘরে তিল ঠাসা। তিল রাজস্থানের একটা প্রধান খাদ্যশস্য। তিলের তেলেই যাবতীয় রান্না করে, মিষ্টি বানায়, এমন কি মুড়ি মুড়কির মত মুঠোমুঠো কাঁচা তিল খায়। গোপালজী যখন ঘুরে ঘুরে বাড়ির সব কিছু দেখাচ্ছিলেন ওনার বুড়ো বাবাও এসে যোগ দিলেন। তিলের ঘর থেকে এক মুঠো সাদা তিল আমাদের দিয়ে বললেন—খাও। আমরা খেতে ইতস্ততঃ করছি দেখে বুড়ো বললেন—খাও, ভাল লাগবে, তাগদ লাগবে। এই বলে নিজে খানিকটা তিল মুখে ফেলে চিবোতে লাগলেন।

গোপালজীর বাবার বয়স প্রায় আশি বছর। কিন্তু দেখে বোঝা যাবে না অত বয়স। বুড়ো বেশ শক্ত সমর্থ। দেহ বাঁকে নি এতটুকু। কথা বলার ধরন বলিষ্ঠ। সব থেকে আশ্চর্য, মনে হল দাঁত সব ক'টিই আছে! এখনও মাঠে যান দু' বেলা; হাল চালান। আমাদের সঙ্গে যখন এসে যোগ দিলেন তখন গা মাথা পা ভর্তি ধুলোকাদা। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। একগাল হেসে বললেন—তোমরা আসবে বলে আজ আমি একটু তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে ফিরলাম। গোপালজীর মাও এলেন। একজন অতি সাধারণ গ্রাম্য বৃদ্ধা। বুড়ো হিন্দী জানেন, কিন্তু বুড়ী বিন্দুমাত্র হিন্দী বোঝেন না, বলা তো দূরের কথা।

বাড়ি দেখা শেষ হল। এবার গোয়াল দেখার পালা। গরু দেখাতে দেখাতে বৃদ্ধ সমানে বলে যেতে লাগলেন, কোন্ গরু কি জাতের, কতখানি দুধ দেয়, যখন কিনে আনেন কত টাকা লেগেছিল ইত্যাদি। দেখলাম বৃদ্ধ গরু বাছুর এবং চাষ আবাদ নিয়ে মশগুল। আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখবার ফাঁকে ফাঁকে কেবল চাষ আবাদের গল্প করে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে বৃদ্ধের ক্ষেদোক্তি যে ইচ্ছে থাকলেও রুক্ষ জায়গা এবং জলের অভাবের জন্যে অনেক কিছু চাষ করা যায় না বা অনেক পরিশ্রম বিফল হয়ে যায়।

সব দেখা শেষ হয়ে গেলে উঠোনে দড়ির খাটিয়া পাতা ছিল তার ওপর বসলাম। রুমী বলল—গোপালজি, এখনও আপনার স্ত্রীকে দেখলাম না কেন?

গোপালজী এখনও বাবা-মার সামনে বৌ-এর কথায় লজ্জা পান। সলজ্জ-ভাবে একবার বাবা-মার দিকে দেখে নিয়ে বললেন—ও রান্নাঘরে।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের খাবারঘরে ডাক পড়ল। আমরা খেতে বসলাম। পাক্কা রাজস্থানী খানা। মোটা মোটা রুটি, মক্কা আর যব মেশান, জবজবে ঘি মাখা। গোপালজী বললেন যে, বাড়ির তৈরী ঘি। বাড়ির তৈরী খাঁটি গাওয়া ঘি। আমি আর রুমী একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলাম—আমাদের পেটে সহ্য হবে তো? রুটির সঙ্গে তরকারি লম্বা-লম্বা বেগুন টক দিয়ে, আর আলুমটর। আলুমটরটা দেখছি সব জায়গার তরকারি। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই যেখানেই গেছি দেখেছি সবারই প্রিয় আলুমটর। সুকুমার রায়ের অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু সবার চাইতে ভাল চাপাটি আর আলুমটর।

পরিবেশ মানুষকে কত পালটে দেয়। নিজের বাড়িতে ঐ খাবার হয়তো রুচত না। কিন্তু গোপালজীর বাড়িতে ঐ খাবার বেজায় ভাল লাগল। পরিবেশন করছিলেন গোপালজীর স্ত্রী। ঘাগরা পরা, তার ওপর সার্টের মত হাতাওলা ব্লাউজ। একটা রঙিন ওড়না দিয়ে গায়ের ঊর্ধ্বাংশ জড়ান, তাই

দিয়েই সারা মুখ ঢেকে ঘোমটা দেওয়া। এমন ভাবে ঘোমটা টানা যে চিবুকটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

রুমী বলল—ঘোমটা সরাও ভাই, তোমার মুখ একটুও দেখতে পাচ্ছি না যে!

ঘোমটা সরাবার উপায় নেই। জনান্তিকে গোপালজী জানালেন যে বুড়ো বাবা পছন্দ করেন না যে ঘোমটা কম থাকুক। তবে বাবা বাড়িতে না থাকলে ওর ঘোমটা কম থাকে। এটা নাকি গোপালজীর প্ল্যান।

রুমী বলল—বহিন্‌জী, তোমার নাম কি?

ঘোমটার আড়াল থেকে কোন উত্তর এল না। বৌটির হয়ে গোপালজী উত্তর দিল—চম্পাবাঈ।

চমৎকার নাম। 'বাঈ' বা 'বাই' এটা মহিলাদের নামের শেষে সম্মান-সূচক। আমাদের দেশে 'বাঈ' কথাটা অন্যভাবে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছে একথার মানে অন্যরকম হয়ে গেছে। বাঈ নাচ বা বাঈজীকে আমরা মোটেই ভাল চোখে দেখি না। কিন্তু বাঈজী আর বাঈ এক নয়। ভারতের সেরা সেরা মহিলারাই তো বাঈ, নয় কি? যেমন মীরাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ। খাওয়ার পর চা এল। চা খাওয়া সাধারণ রাজস্থানীদের বিলাসিতা। মধ্যবিত্ত বা গরিব ঘরের ছেলে বুড়োরা হাতে পয়সা থাকলে অন্য কিছু কিনে খাওয়ার আগে এক কাপ চা কিনে খাবে। এটা তাদের শখ। স্কুল-কলেজের ছেলেদের দ্বিতায় শখ মদ খাওয়া। দিশী মদ। রাজস্থানীদের বড় মদের নেশা।

গোপালজী বললেন—জানি না, আমার ছেলেরা যখন বড় হবে এই বাজে জিনিসটার কাছ থেকে ওদের দূরে রাখতে পারব কিনা। সরাব বড় খারাপ জিনিস।

এবার গোপালজী-পরিবারের ফটো তোলবার পালা। রুমী বলল—পুরো একটা রাজস্থানী পরিবারের সঙ্গে আমি মিলে মিশে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি ছবি তোল।

উত্তম প্রস্তাব। রুমী উদ্যোগী হয়ে বাড়ির মধ্যে সাইট সিলেক্‌শান করে কে কিভাবে কোথায় দাঁড়াবে গ্রুপ ঠিক করে দিল। গোপালজী, ওনার বৌ, তিনটে ছেলেমেয়ে, দুই বোন, বাবা, মা সকলেরই একসঙ্গে ফটো থাকবে। আমি ছবি তোলবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। গোপালজী বললেন—আর একটু দাঁড়ান, আর ছেলেমেয়েগুলো রাস্তায় খেলা করছে, ডেকে আনি। এই বলে গোপালজী ডেকে নিয়ে এলেন আরও গুটিচারেক বাচ্চাকে। আমি গোপালজীকে বললাম—এই সাতটি বাচ্চাই আপনার?

গোপালজী বললেন—হ্যাঁ।

বেশ, এবার তবে ছবি তোলা যাক। কিন্তু মুশকিল হল গোপালজীর বৌকে নিয়ে। একগলা ঘোমটা। মুখ দেখা না গেলে ছবিতে কি আসবে? রুমী বলল—আমি ঠিক সময়ে ম্যানেজ করে দেব। যেই রেডি বলবে আমি চট করে ঘোমটা সরিয়ে দেব। রুমীর কথায় একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কারণ কলকাতায় ফিরে ওদের নিশ্চয়ই এক কপি ফটো পাঠিয়ে দেব। তখন তো বৌ-এর ঘোমটা খোলা মুখ দেখে বুড়ো শ্বশুর রাগ করতে পারেন। আমি গোপালজীকে সমস্যার কথা জানালাম। গোপালজী রুমীর প্ল্যানকে ভিটো দিল।

গোপালজীর বাড়ি থেকে আসবার সময়ে গোপালজীর বাবা একঠোঙা তিল দিয়ে দিলেন, সাদা তিল, বললেন—গুড় দিয়ে খাবে।

কত সরল এই গোপালজীরা। গোপালজীদের মত সরল লোক রাজস্থানে অনেক আছে। এ অহংকার রাজস্থান করতে পারে। রাজস্থানের লোকেরা ভাল মানুষ। মাড়োয়ারীরাও রাজস্থানী। অনেকের ওদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা আছে। আর থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়, কারণ কলকাতার বড় বাজারের মাড়োয়ারীরা এর জন্যে দায়ী। কিন্তু রাজস্থানে গেলে দেখা যাবে রাজস্থানের মাড়োয়ারীর সঙ্গে বড়বাজারের মাড়োয়ারীর অনেক পার্থক্য।

আলোয়ার থেকে বিদায় নেবার দিন গোপালজী এসেছিলেন আমাদের 'সি অফ্' করতে। যতক্ষণ ট্রেন না ছাড়ে ততক্ষণ অনেক গল্প করেছিলেন। বার বার বলে দিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে আলোয়ার কেউ এলে তাঁর ঠিকানায় যেন যোগাযোগ করেন, তাহলে অতিথি সেবার কোন ত্রুটি হবে না।

কিন্তু হায়! কলকাতায় ফেরার মাস তিনেক পরে খবর পেলাম এক পথ-দুর্ঘটনায় গোপালজী মারা গেছেন।

আলোয়ার থেকে চলে এসেছি জয়পুরে।

গোপালজীদের মত এক সরল মাড়োয়ারী জুটে গেল জয়পুরে। সাধারণ-ভাবেই আলাপ মিঃ ভাণ্ডারীর সঙ্গে।

জয়পুরের সব থেকে বিপণিবহুল এবং গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হল মির্জা ইসমাইল রোড। ঠিক স্টেশনের সামনে থেকে আরম্ভ হয়ে শহরের বুক চিরে চলে গেছে বহু দূর। মির্জা ইসমাইল রোড জয়পুরের একটি চ্যালেঞ্জ! কিছুদূর যাওয়ার পর এর নাম হয়েছে সংক্ষিপ্ত—এম. আই. রোড। স্থানীয় কিছু অসাধু গাড়ির চালক দুটি আলাদা রাস্তা বলে বুঝিয়ে ঠকায়। তাতে ওরা বেশী পয়সা ভাড়া বাবদ আদায় করতে পারে। সেদিন সন্ধ্যের সময় এইভাবে আমাকে ঠকিয়ে বেশী ভাড়া আদায় করবার চেষ্টা করছিল সাইকেল-রিকশাওলাটা।

আমিও প্রচুর কথা কাটাকাটি করছিলাম। ওকে বলছিলাম, বাপু, একই রাস্তা এটা। কিছুটা পুরো নাম আর কিছুটা ঐ নামের সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়েই এ রাস্তা। কিন্তু কে কার কথা শোনে! সাইকেল-রিকশাওলা মদ খেয়েছে। লাল চোখে নেশার ঘোরে সে দাবি করে যাচ্ছে যেহেতু মির্জা ইসমাইল রোডের নাম করে আমি এম. আই. রোডে এসেছি সেই জন্যে বেশী ভাড়া দিতে আমি বাধ্য। রুমী ব্যস্ত হয়ে বার বারই বলছে, যা চায় দিয়ে দাও। আমি তখন বিভ্রান্ত, কি করব বুঝতে পারছি না। সঙ্গে স্ত্রীলোক রয়েছে; গোলমাল না করাই ভালো। অথচ অন্যায়ের কাছে মাথা নত করতেও ঠিক মন চাইছে না। এমন সময়ে ভাণ্ডারীর আবির্ভাব। যা ভাড়া ঠিক করা হয়েছিল তিনি আমাকে সেই ভাড়াটাই সাইকেল-রিকশাওলাকে দিয়ে দিতে বললেন। আমি তাই করলাম, ভাণ্ডারী তারপর রিকশাচালককে খুব ধমকে ভাগিয়ে দিলেন। ভাণ্ডারীর সঙ্গে তারপর এ-কথা সে-কথা—কোথা থেকে আসছি, কতদিন থাকব, কোথায় কোথায় যাব, জয়পুরে কোথায় উঠেছি ইত্যাদি। ওঁর সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। আমাদের হোটেলের ঠিকানা তিনি নিয়ে নিলেন, বললেন—আবার দেখা হবে।

ভাণ্ডারী চলে গেলেন।

পরদিন সকাল আটটা। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরোব বলে প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময়ে রুমে টেলিফোন বেজে উঠল। নীচের অফিস ঘর থেকে ফোনে জানাল মিঃ ভাণ্ডারী নামে এক ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান। বুঝলাম গতকালের ভাণ্ডারী। ভদ্রলোককে আমাদের রুমে পাঠিয়ে দিতে বললাম একটু পরেই হাসিমুখে ভাণ্ডারী এসে হাজির হলেন। ওনাকে দেখে ভালই লাগল। বললাম—আসুন, আসুন।

ভাণ্ডারীর সঙ্গে এসেছেন আর একজন ভদ্রলোক। কালো রং একটু মোটা-সোটা, চুলগুলো কাঁচা-পাকা মেশান ছোট ছোট করে কাটা। বয়স মনে হয় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন। ভুঁড়ির ওপর আঁট করে পরা ইংলিশকাট ঢোল্লা প্যাণ্ট। পায়ের জুতোতে কোন পালিশ নেই। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—"A man is known by the shoes he wears." যদি এই প্রবাদটি সত্যি হয় তাহলে ভদ্রলোককে ধরে নিতে হবে রাম-শ্যাম। ভদ্রলোক পোশাকে যেমন আচরণেও তেমনি। আদপ কায়দার ধার ধারেন না। আমাদের রুমে ঢুকেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

ভাণ্ডারীর সঙ্গে যেমন হিন্দীতে কথা বলছিলাম সেইভাবে ভদ্রলোককে বললাম—আপনার সঙ্গে তো পরিচয় হল না।

ভদ্রলোক বিনয়ের সঙ্গে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—আমি এখানেই থাকি, মানে জয়পুরেই থাকি। ভাণ্ডারীর বিজ্‌নেস পার্টনার।

ভদ্রলোকের বাংলা বলা শুনে একটু অবাক্ হয়ে বললাম—আপনি তো বেশ ভাল বাংলা বলেন!

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন—আমি বাঙালীই। আমার নাম হৃদয়-হরণ ভট্টাচার্য।

একেবারে ভট্টাচার্য! রুমী এবার বাঙালী ভট্টাচার্যের প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। রুমী বলল—জয়পুরে অনেক প্রবাসী বাঙালী আছেন শুনেছি, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি।

ভট্টাচার্য বললেন—আমাকে আর প্রবাসী বাঙালী বলে লাভ নেই, কারণ এখানে তো আমি দু'দশ বছর হল নেই, আমি জয়পুরে আছি দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর।

রুমী বলল—সাঁ-ই-ত্তি-রি-শ বছর? আপনি তাহলে খুব অল্প বয়সে ঘর ছাড়া।

ভট্টাচার্য বললেন—তা বলতে পারেন। তবে খুব অল্প বয়সে নয়। আমি যখন এখানে আসি তখন পূর্ণ যুবক।

রুমী জিজ্ঞাসা করল—আপনার তাহলে এখন বয়স কত?

ভট্টাচার্য একটু হেসে বললেন—আপনাদের কত মনে হয়?

রুমী বলল—পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন।

ভট্টাচার্য আগের মতই হাসি-হাসি মুখে বললেন—দশ বছর আগে আমার পঞ্চান্ন বছর বয়স ছিল।

আমরা এবার একটু বিস্মিত হলাম! ভট্টাচার্যের পঁয়ষট্টি বছর বয়স!

রুমী বলল—আপনি বয়স বাড়িয়ে বলছেন না তো? দেখে তো কখনই মনে হয় না আপনি ষাট পার করেছেন।

ভট্টাচার্য বললেন—পুরুষরা অন্ততঃ বয়সটা ঠিক বলবার চেষ্টা করে। আমার মেজমেয়ের বয়স আপনার বয়সের সমান।

এরপর ভট্টাচার্য তাঁর পরিবারের গল্প বলতে লাগলেন। ছেলে একটি আছে। ঝরিয়া কলিয়ারীতে কাজ করে। মেয়ে তিনটি—তিনজনই জয়পুরের বিভিন্ন স্কুলে কাজ করে। শিক্ষকতার কাজ। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, ছোটটির জন্যে পাত্র খুঁজছেন। আমাকে বললেন—দিন না আপনাদের ওদিককার একটি সুপাত্রের সন্ধান। আগের দুটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি এখানকার বাঙালীদের সঙ্গে। ছোট মেয়ের শ্বশুর বাড়ি আর এসব অঞ্চলে করবার ইচ্ছে নেই, পশ্চিমবাংলার কোথাও হোক।

আমি বললাম—এখানকার বাঙালী তো বেশ ভাল, তবে অসুবিধা কোথায়?

ভট্টাচার্যের জবাব—অপছন্দ ঠিক নয়, তবে প্রত্যেকের একটা সাধ

আহ্লাদের প্রশ্ন আছে। আমার পৈতৃক ভিটে চব্বিশ পরগণা জেলায় কদমগাছিতে। তাই একটা কুটুম বাড়ি ঐ সব অঞ্চলে হোক এটা গিন্নীরও ইচ্ছে।

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের এখানেই মুশকিল। কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলেই ধান্দা থাকে পাত্র পাওয়া যাবে কিনা। যাই হোক মুখে বললাম —তা বটে। কিন্তু আপনি আঠাশ ত্রিশ বছর বয়সে এখানে হঠাৎ চলে এলেন কেন? কোন আত্মীয়স্বজন এখানে ছিলেন, না নিছক চাকরির খাতিরে?

ভট্টাচার্য বললেন—আত্মীয়স্বজন সে সময়ে আমার এখানে কেউ ছিল না। আর চাকরি? ও জিনিসটাকে আমি বরাবরই বিশেষ পছন্দ করি না। ব্যবসা ভালবাসি। বাঙালীরা একটা জিনিসকে খুব চেনে, সেটা চাকরি। বাঁধা মাইনে মাস কাবারে পাবার নিশ্চয়তা থাকে, তা যা মাইনেই হোক না কেন, এটাই তাদের নিশ্চিন্ততা। এই জন্যেই চাকরি চাকরি করে। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য করার ঝুঁকি তারা নেবে কেন? আর একটা কথাও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমাদের বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না। ঐ যে কি বলে—"বেদের ছাঁ বেদ পড়ে, ইঁদুরের ছাঁ মাটি খোঁড়ে"। এ প্রবাদটা মশাই খুব খাঁটি। পূর্বপুরুষরা কেউ কেউ কখনও ব্যবসা করলেও পুরুষানুক্রমে বাঙালীরা চাকরি করে যাচ্ছে। অনেক আশা নিয়ে, অনেক টাকা ব্যয় করে এক চাকুরে বাপ ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছে কোন্ আশায়? সেই এক আশায়। ছেলে একজন বড় চাকুরে হবে। কিন্তু যে দেশে এসেছেন তাদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—একটি লোটা কম্বল নিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভারতের যে কোন জায়গায়। কিছুকাল ব্যবসা করে যখন দেশে ফিরছে টাকার বালিশ নিয়ে ফিরছে। চাকরি করে মশাই টাকার বালিশ নিয়ে ফেরা যায় না, বুঝলেন? ওরা ফেরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, টাকার বোঝা নিয়ে। আর আমরা বাঙালীরা কি করি? মাড়োয়ারীদের বললাম যে, বাপু, তোমরা ব্যবসা কর, কিন্তু আমাদের একটা করে চাকরি দিও। অনেক কাল আগে মানসী ও মর্মবাণী না মাসিক বসুমতী ঠিক মনে পড়ছে না, কোথায় যেন পড়েছিলাম একটি সচিত্র ছড়া—

"আমরা বাঙালী চাকরি কাঙালী
কেরানীগিরি সার।
ঘাড়ে চেপে বসে মাড়োয়ারী শেষে
চুষে লয় যাহা সার।"

এই তো আমাদের অবস্থা! বাঙালীদের একটা দোষ হচ্ছে বড় ঘরকুণো।

নিজের জায়গা ছেড়ে একদম নড়তে চায় না। আমার কিন্তু ওসব নেই। ব্যবসা করব ঠিক করে এক কাপড়ে এখানে চলে এসেছিলাম।

আমি বললাম—আপনি বলেছেন বংশানুক্রমিক না হলে ব্যবসা করতে পারা যায় না। বাঙালী তাই ব্যবসা করতে পারে না। কিন্তু আপনার বংশে কেউ কি ব্যবসা করেছেন?

ভট্টাচার্য বললেন—কেউ না। আমি নামলাম প্রথম ব্যবসা করতে।

বলে তিনি একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। একটু থেমে আবার বললেন—Exception Proves the law. ব্যতিক্রমই নিয়মের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। আমি সেই ব্যতিক্রম মশাই। আর নিয়ম মশাই আমার ছেলেটা, সে এসব ব্যবসা-ট্যবসার ধার দিয়ে যায় না। সে ঠিক ঝরিয়াতে একটা চাকরি করে যাচ্ছে।

এই বলে হা-হা করে তিনি একটু হেসে নিলেন।

আমি দেখলাম ভট্টাচার্যের বাক্‌চাতুর্য আছে। কিন্তু একটু সন্দেহ জাগছিল। নিছক ব্যবসা করতে হবে বলেই কি ভট্টাচার্য কদমগাছি ছেড়ে, বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে সুদূর রাজস্থানে এসেছেন? যদি ব্যবসা করতে দূর দেশেই আসবেন তবে মরুভূমি পাথরের দেশে কেন? জল বৃষ্টি আছে, মাটি রুক্ষ নয় এমন দূর দেশের অভাব ভারতবর্ষে নেই তো; এখন না হয় রাজস্থান অঞ্চলে অনেক কলকারখানা হয়েছে, লোকজন এসেছে, বসবাস করছে। সরকারী চেষ্টায় চাষ আবাদের উন্নতি করবার চেষ্টা চলছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ অনেক খুলে গেছে। কিন্তু সাঁইত্রিশ বছর আগে ভট্টাচার্য এখানে এসেছিলেন কোন্ ভরসায়? ভট্টাচার্যকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম।

ভট্টাচার্য চালাক লোক, কিন্তু দিলখোলা। হো-হো করে হেসে বললেন—ঠিক ধরে ফেলেছেন ব্যাপারটা। নিছক ব্যবসার জন্যেই কি এত দূর দেশে চলে এসেছিলাম!

ভট্টাচার্যের কথায় রুমী খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ভট্টাচার্য বললেন—যখন ব্যাপারটা আপনাদের একটু গোলমেলে ঠেকছে তখন তার নিরসন করা নিশ্চয় উচিত।

আমরা দুজনেই ভট্টাচার্যের বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললাম।

ভট্টাচার্য বলতে লাগলেন—আমি গ্রামের ছেলে হলেও কলকাতায় মামার বাড়ি থাকতাম আর শখের থিয়েটার একটু-আধটু করতাম। এই সময়ে একটি মেয়ের প্রেমে পড়লাম। প্রেমে পড়লাম মানে মেয়েটিই প্রথমে আমার প্রেমে পড়ল। দেখতে শুনতে ভাল, কিছু গুণ-টুনও ছিল। কাজেই আমিও তাকে বিমুখ করলাম না। বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে ফেললাম। না জানিয়ে বিয়ে করলাম তার কারণ আমার বাবা-মা এবং মামার বাড়ির কেউই

এ বিয়েতে মত দেবে না আমি জানতাম। এর কারণ আমি তখন বেকার এবং পাত্রী আমার স্বনির্বাচিত অথচ মশাই দেখুন, পালটা ঘর। এমন নয় যে আমি একটা অজাত-কুজাতের মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করছি। আর মশাই, তার পরেও একটা কথা আছে, সেটা হল একজন সুন্দরী যুবতীর প্রথম ভালবাসা আমি কি প্রত্যাখ্যান করতে পারি? আপনারা এখন জয়পুরে দু'একদিন আছেন তো, আমার বাড়িতে নিশ্চয় একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। তখন দেখবেন আমার স্ত্রী সুন্দরী কিনা! ও এখন বুড়ো হয়েছে তবু দেখবেন কত রূপসী!

এই পর্যন্ত বলে ভট্টাচার্য থামলেন। বোধ হয় গিন্নীর যৌবনের রূপটা একবার কল্পনা করে নিলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভট্টাচার্য আবার শুরু করলেন—এই যে ভাণ্ডারী; যে এখন আমার বিজ্‌নেস পার্টনার, কখনও কলকাতায় যায় নি। আজও কলকাতা দেখে নি। কিন্তু ওর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট প্রায়ই ব্যবসার খাতিরে কলকাতায় যেত। এবং সেই সূত্রে তার সঙ্গে আমার কলকাতায় পরিচয় এবং পরে ঘনিষ্ঠতা হল। তারই ওপর নির্ভর করে বৌএর হাত ধরে চলে এলাম জয়পুরে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট গোবিন্দ আমাকে তার মনিব এই ভাণ্ডারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। সেই থেকে ভাণ্ডারীর পার্টনার হয়ে কাজ করছি।

ভট্টাচার্য এই পর্যন্ত বলে থামলেন। লক্ষ্য করলাম একবারও কিন্তু ভট্টাচার্য কিসের ব্যবসা করেন তা আর বলছেন না। আমরাও আর জানবার চেষ্টা করলাম না।

ভট্টাচার্য আবার বললেন—এক্ষেত্রেও গোবিন্দের জন্যে আর একবার বাঙালী রাজস্থানে এল।

আমি কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম—কেন, গোবিন্দবাবু কি আপনার আগে আরও বাঙালীকে রাজস্থানে এনেছেন?

ভট্টাচার্য দিলখোলা হাসি হেসে বললেন—হিউমারটা বুঝলেন না?

আমি আর রুমী সত্যিই কি হিউমার বুঝলাম না।

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ভট্টাচার্য বললেন—নাঃ! আপনি রাজস্থানের ইতিহাস কিছুই জানেন না দেখছি। আমি একটু ইতিহাসের কথা বললাম। রাজস্থানে আগে হিন্দু বাঙালী একটিও ছিল না। দিল্লীর সিংহাসনে তখন ঔরঙ্গজেব। হিন্দুদের ওপর তার দারুণ বিদ্বেষ। হিন্দুরা গান বাজনা করতে পারবে না। দেব-দেবী পুজো করতে পারবে না। কিন্তু ধর্ম-কর্ম ছাড়া কি হিন্দু থাকতে পারে? তারা ঠিক লুকিয়ে পুজো-আর্চা করতে লাগল। আর যায় কোথায়? ঔরঙ্গজেবের যত রাগ গিয়ে পড়ল হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহের ওপর। ঢালাও হুকুম হল—ভেঙে ফেল সব বিগ্রহ, কলুষিত করে দাও

সব দেবস্থান। দিল্লী আগ্রার খুব কাছে মথুরা, বৃন্দাবন। সেখানে বিগ্রহের সংখ্যা তখন অগুনতি! সুতরাং সেখান থেকেই প্রথমে নিধন শুরু করল যবনের দল। সেই সময় বহু হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ রাজস্থানের রাজারা নিয়ে এসে রেখে দেন। সেই সময়েই সেবাদির জন্যে অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণদেরও রাজস্থানে আনা হয়। এইভাবেই সেদিন বাঙালীরা রাজস্থানে এসেছিল।

আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম—তাই কি? আমার ধারণা আরও আগে বাঙ্গালী রাজস্থানে এসেছিল। রাজা মান সিং অম্বরে যখন বাংলাদেশ থেকে যশোরেশ্বরী কালীকে নিয়ে গিয়ে মন্দির স্থাপন করলেন সেই সময়ে বিগ্রহের সঙ্গে কয়েকজন বাঙালী পুরুতকেও রাজস্থানে নিয়ে এসেছিলেন। সেই প্রথম বাঙালী রাজস্থানে এল।

ভট্টাচার্য বললেন—না মশাই, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। সে সব কথা সুযোগ পেলে পরে বলব।

বললাম—আচ্ছা, তারপর?

তিনি আবার শুরু করলেন—সেই সময়ে জয়পুরের রাজা সোয়াই জয় সিং। বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এলেন গোবিন্দ মূর্তি। এনে রাখলেন নিজের প্রাসাদ মন্দিরে, আর সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন কিছু ব্রাহ্মণকে। গোবিন্দর জন্যেই রাজস্থানে স্থান পেল বাঙালী ব্রাহ্মণ। আর আমাকেও তো গোবিন্দই নিয়ে এল রাজস্থানে। কাজেই সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে গোবিন্দই রাজস্থানে বাঙালী আমদানি করছে, নয় কি?

ভট্টাচার্যর রসবোধ এবং পরিবেশনার তারিফ করতেই হয়। আমরা যে তাঁর রসবোধের মর্যাদা বুঝতে পেরেছি এটা বোধহয় তিনি বুঝলেন। তাই আমাদের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে আবার বললেন—বুঝলেন? কি বুঝলেন? আমি শুকনো দেশে পড়ে আছি বলে রসবোধ আমার শুকিয়ে যায় নি, কি বলেন?

আমি বললাম—রসিকজনদের রসবোধ কখনও শুকোয় না।

ভাণ্ডারী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। হয়তো কিছু বুঝছিলেন অথবা বুঝছিলেন না। ভাণ্ডারীকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

আমি বললাম ভাণ্ডারীকে—আপনি কিছু বলুন, আমরা এত গল্প করছি যে আপনাকে কিছু বলার সুযোগই দিচ্ছি না। বাঙালীরা গল্প করতে পেলে আর ছাড়ে না। বিশেষ করে যদি তাদের দলে মেয়ে থাকে।

কথাটা শুনে রুমী আমার দিকে একবার কটমট করে তাকাল।

ভাণ্ডারী বললেন—ভট্টাচার্যকে নিয়ে এলাম বাঙালী বলে। আপনারাও বাঙালী। দেখুন কোন আত্মীয়তা বেরিয়ে যায় কিনা।

ভট্টাচার্য বললেন—জয়পুরের কি কি দেখলেন ?

বললাম—এখনও কিছু দেখা হয় নি ! এখন বেরোচ্ছিলাম।

ভট্টাচার্য বললেন—সকালের দিকে তাহলে আপনাদের অনেকটা সময়ই নষ্ট করে দিলাম। ছিঃ !

বললাম—নষ্ট কেন বলছেন ? আপনার সঙ্গে আলাপ করে বেশ আনন্দ পেলাম।

ভট্টাচার্য বললেন—যদি আপত্তি না থাকে চলুন আমরা আপনাদের সঙ্গী হই।

রুমী বলল—ভালই তো, চলুন। আপনারা এখানকার লোক, সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে। কাল সন্ধ্যেবেলা মির্জা ইসমাইল রোড আর এম. আই. রোড নিয়ে যা মুশকিলে পড়েছিলাম !

ভট্টাচার্য বললেন—ভাণ্ডারীর কাছে সেকথা শুনেছি।

এই বলে ভাণ্ডারীর দিকে ফিরে বললেন—জয়পুরে কি কি দেখবার আছে ?

আমি অবাক্ হয়ে বললাম—সে কি, এতকাল এখানে রয়েছেন, আপনি জানেন না এখানে কি কি দ্রষ্টব্য ?

ভট্টাচার্য যেন একটু অপ্রস্তুত হলেন। বললেন—না মশাই, আমি এখানকার অনেক কিছুই দেখবার সুযোগ পাই নি ! প্রধান প্রধান কয়েকটা দ্রষ্টব্য দেখেছি মাত্র ! কিন্তু আপনারা তো খুঁটিয়ে দেখবেন, নয় কি ?

জয়পুর শহরে নানারকম যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। সিটি বাস আছে। স্টেশন ওয়াগন আছে। দিল্লী বা ব্যাঙ্গালোরের মত ফট্ফটিয়া বা অটো রিকশা আছে। একটু পয়সা খরচ যদি করা যায় তো ফুরনে অ্যামবাসাডর গাড়ি পাওয়া যায়।

প্রথমে আমরা অম্বর বা আমের চললাম। মোটরেই যাচ্ছি। জয়পুর ছাড়িয়ে যখন অম্বরের পথ ধরলাম দেখলাম নিরিবিলি পথ। বেশ ভাল লাগল। অম্বরে যাবার পথে এক জায়গায় পুলিস আমাদের গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমরা ট্যুরিস্ট কিনা এবং আমের যেতে কত ভাড়া নিচ্ছে। যাত্রীদের কাছ থেকে মওকা পেয়ে বেশী ভাড়া নিচ্ছে কিনা দেখা ওদের কর্তব্য। ভাল লাগল এই ব্যবস্থা। যাত্রীরা সব জায়গায় জবাই হবার পশু। নতুন জায়গায় গেছে কি ব্যস্, গলা গেল। কিন্তু এই রকম সরকারী কড়া ব্যাপার থাকলে যাত্রীদের বেঘোরে গলা কাটা যায় না। এরকম ব্যবস্থা করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সরকারের কাছে।

জয়পুর থেকে অম্বরের দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। শহরের উত্তর দিক দিয়ে যে পাহাড়ে পথটা চলে গেছে ওটাই অম্বরে যাবার পথ। উত্তর দিকের পথটা দিয়ে একটু এগোলে আর একটা পথ ডান দিকে চলে গেছে, সেটাও পাহাড়ে পথ, জয়পুরের জলমহলের বিশাল ঝিলের ধার দিয়ে চলে গেছে। ও রাস্তাটা গেছে রামগড় জয়পুর থেকে মাইল ষোল হবে। সেখানে আছে বিরাট হ্রদ। কৃত্রিম নয়, প্রাকৃতিক। তাতে আছে আবার কুমীর। ওরা স্থানীয় ভাষায় বলে মকর। মকরের ভয়ে হ্রদে কেউ স্নান করে না। রামগড়ের কথা পরে বলব। এখন আমরা আমের যাচ্ছি। অম্বরকে স্থানীয় লোকেরা বলে আমের। আমার সুবিধেই হল। কখনও অম্বর বলব কখনও আমের বলব। আমাদের মোটর হু-হু করে যাচ্ছে। ডান দিকে পড়ল জয়পুরের 'জলমহল'। বিরাট এক হ্রদের মাঝখানে একটি প্রাসাদ। এককালে রাজা রানীরা গ্রীষ্মকালে এখানে আসতেন বিশ্রাম করতে। এখন এটি পরিত্যক্ত। ভট্টাচার্য বললেন—শীঘ্রই নাকি এখানে হোটেল খোলা হবে। হবে হয়তো। আমি অনেকের কাছে শুনেছি রাজাদের রাজত্ব গেলেও প্রাসাদগুলো এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে। রাজ্য যাওয়ায় প্রাসাদগুলোতে এখন হোটেল খুলে আয়ের পথ বাড়ান হচ্ছে। মতলবটা খারাপ নয়, একটা ব্যবসা তো বটে। ওই সব হোটেলে কতখানি সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায় জানি না। কিন্তু যাত্রীদের এখানে থাকতে গেলে দৈনিক বেশ মোটা টাকার বিনিময়ে থাকতে হবে।

জলমহলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে রুমী চুপিচুপি আমায় বলল—রাজপুত রানীদের মত জলমহলে শুয়ে শুয়ে একটু হাওয়া খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি কি পারবে রাজা আমার ইচ্ছে পূর্ণ করতে?

বললাম—দুঃখিত মহারানী!

পাহাড়ের ওপর আমেরের দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং প্রাসাদ। তাকে ঘিরে আছে কয়েক মাইল ব্যাপী চওড়া পরিখা। কিছুক্ষণ হল বাঁ দিকে সেই পরিখা শুরু হয়ে গেছে। বুঝলাম আমেরে পৌঁছে গেছি। ঐ তো পাহাড়ের ওপর বিখ্যাত দুর্গ দেখা যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিং-এর তৈরী বিখ্যাত দুর্গ।

আমের বা অম্বরকে দেখলে কত কথাই মনে পড়ে। রাজা জয়সিংহ জয়পুর শহরের পত্তন করে রাজস্থানের রাজধানী করলেন। তার আগে প্রায় ছ' শ' বছর ধরে অম্বর রাজপুতানার রাজধানী ছিল। প্রকৃতপক্ষে কাছাওয়া বংশের রাজারা ছিলেন অম্বরের মালিক। বাবর এই পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করলে কাছাওয়াদের সঙ্গে মোগলদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু বাবরের রাজত্বকাল ভারতে মাত্র পাঁচ বছর। ১৫৩০ সালে বাবরের

মৃত্যুর পর সে বন্ধুত্ব গেল ঘুচে। কাছাওয়াদের পরে মীনা জাতিরা অম্বরের মালিক হল। মীনা জাতির এক রাজা ধুন্দর রাজ্য শাসন করত। তার রাজধানী করল অম্বরকে। মীনা জাতি ছিল অজেয়। ওদের হাতে অস্ত্র থাকলে আর রক্ষা নেই। কার সাধ্য ওদের হারায়! কিন্তু একটি দিন ছিল ব্যতিক্রম। সেটি দোলের দিন, ওদের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। ঐ দিন ওরা অস্ত্রশস্ত্রকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিত অর্থাৎ ঐ দিন কোন কারণেই ওরা অস্ত্র ধারণ করত না। মানসিংহ আগেও চেষ্টা করেছেন ধুন্দর রাজ্যকে জয় করতে, কিন্তু দুর্দান্ত মীনাদের হাতে পরাজিত হয়ে ফিরে গেছেন। যুগে যুগে সব জাতের মধ্যেই মিরজাফর থাকে। অতএব মীনাদের মধ্যেও একজন বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর ছিল। যে ভাবেই হোক সে ফাঁস করে দিয়েছিল সেই অস্ত্র না ধরার দিনটির কথা। মানসিংহ তখন আকবরের প্রিয় সেনাপতি। প্রিয় হবারও কারণ ছিল অনেক, মানসিংহের পিতামহ বাহারমলই প্রথম রাজপুত যিনি মোগল বাদশাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। মানসিংহের পিসীকে আকবর বিয়ে করেন। দোলের দিন মীনারা অস্ত্র ধারণ করে না। ঐ দিন মানসিংহ বিরাট এক মোগল সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজির হলেন ধুন্দর রাজ্যে। মীনারা প্রমাদ গনল। তারা মানসিংহের কাছে অনুরোধ করে পাঠাল একটা দিন, শুধুমাত্র একটা দিন অপেক্ষা করতে। মানসিংহ একটা দিন অপেক্ষা করবার জন্যে আসেন নি। তিনি জানতেন একটা দিন অপেক্ষা করার পরিণাম কি! তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। 'এক দিনের অসহায়' মীনাদের ভীষণ-ভাবে পর্যুদস্ত করে তিনি আকবরের জন্যে জয় করলেন ধুন্দর রাজ্য। আকবর অবশ্য ধুন্দর রাজ্যটি মানসিংহকে দান করে দেন। ধুন্দর রাজ্যে আছে অম্বিকেশ্বর শিবের মূর্তি। সম্ভবতঃ অম্বিকেশ্বর নাম থেকেই অম্বর নামের উৎপত্তি। অম্বরের প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেছিলেন মানসিং যিনি ইতিহাসে প্রথম মানসিংহ বলে খ্যাত। কিন্তু শেষ করেছিলেন সোয়াই জয়সিং। প্রায় একশ' বছর পরে।

মোটরে যেতে যেতে রুমীকে বলছিলাম ঐ কথাগুলো। রুমী সব শুনে বলল—আমি কিন্তু অম্বর নামের আর একটা কারণ বলতে পারি। একটা বইতে পেয়েছিলাম।

রুমীর কথা বিশ্বাস করি, কারণ ও সুযোগ পেলেই নানারকম বই নিয়ে পড়াশুনা করে। আমাকে অনেক সময়ে অনেক বই পড়বার জন্যে সাজেস্ট করে।

বললাম—বল দ্বিতীয় কারণটা।

রুমী বলল—রাজা অম্বরীশ ছিলেন কুশ বংশের রাজা! কুশ বংশ

সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের ছেলে কুশেরই বংশ, কারণ রাজা অম্বরীশও ছিলেন অযোধ্যার রাজা। রাজা অম্বরীশ এই নগরের পত্তন করেন বলে এর নাম অম্বর হয়েছে।

ভট্টাচার্য আমাদের সব কথা শুনছিলেন। বললেন—আপনারা কবির লড়াই-এর মত কিংবদন্তীর লড়াই করছেন দেখছি। বেশ ভালই আছেন। আপনাদের বেড়ান সার্থক। আমার মশাই এই একটা দিক বাদ রয়ে গেল।

আমি বললাম—কেন আপনিও তো কম যান না। রাজস্থানে বাঙালীদের আগমনের ইতিহাস তো আপনার কাছেই শুনলাম।

ভট্টাচার্য একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা পাহাড়ের নীচে এসে পড়লাম। মাওয়াটা হ্রদ ঘেরা পাহাড়ের ওপর দুর্গ, তার ভেতর প্রাসাদ। কালী মন্দির। ওপরে যাবার দুরকম ব্যবস্থা আছে—মোটরে সোজা যাওয়া যাবে, তার জন্যে অবশ্য নির্ধারিত টোল্ ট্যাক্স্ দিতে হবে, আর দ্বিতীয় পন্থা হল হাতির পিঠে চড়ে ওঠা। তার দক্ষিণাও বড় কম নয়! আমরা মোটর নিয়েই উঠে গেলাম। দুর্গের ভেতর মোটরকে নিয়ে গেলাম। দেউড়ি পার হয়েই সামনে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তার একধারে গাড়ি রাখা যায়। আর একদিকে গাছের ছায়ায় সাজান-গোছান কয়েকটা হাতি অপেক্ষা করছে। ওদের মধ্যে কেউ যাত্রী বয়ে এনেছে নীচ থেকে, যাত্রীরা আবার ওর পিঠে চড়েই ফিরে যাবে হয়তো। আর কোন হাতি এমনি অপেক্ষা করছে যদি কোন ভ্রমণ-বিলাসী ওর পিঠে চড়ে দুর্গ টা বেড়াতে চায়। প্রান্তরের চারধারে নানা-রকম দোকান। ফুল, নারকেল, মিষ্টি, নানারকম হস্তশিল্প, কোকাকোলা ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে।

ভট্টাচায গাড়ি থেকে নেমে বললেন—বহুদিন পরে আমেরে এলাম। সেই মেজমেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর এখানকার প্রথা অনুযায়ী মেয়ে জামাইকে এনেছিলাম বিখ্যাত যশোরেশ্বরী কালীর আশীর্বাদ ভিক্ষে করতে। তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে। আসুন এইদিকে, কিছু ফুল ফল কিনে নিই মায়ের পূজোর জন্যে।

আমি আর রুমী ভট্টচার্যকে অনুসরণ করলাম। ফুলের দোকানেই নারকেল আর মিষ্টি পাওয়া গেল। কিনলাম তাই। ভাণ্ডারীও দেখলাম একই কাজ করলেন।

ভাণ্ডারী আমাদের বললেন—আগে দেবী দর্শন।

আমরা সকলে মন্দিরের দিকে এগোলাম। আমাদের মত বহু লোক চলেছে হাতে ফুল নারকেল মিষ্টি নিয়ে দেবী দর্শনে। সকালবেলার অপূর্ব পবিত্র দৃশ্য।

আমরা হাজির হলাম অম্বরের বিখ্যাত কালীবাড়ির সামনে। মন্দিরে প্রবেশ করবার বিরাট রূপোর দরজা।

ভট্টাচার্য বললেন—এই কালীমূর্তি সপ্তদশ শতাব্দীতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোর থেকে নিয়ে এসেছিলেন। প্রতাপাদিত্য এ বিগ্রহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন জানেন?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলতে লাগলেন—মথুরা থেকে।

রুমী একটু আশ্চর্য হয়ে বলল—মথুরা থেকে কালীমূর্তি!

ভট্টাচার্য বললেন—মূর্তি আকারে ঠিক পান নি, কংসের কারাগারে একটি কষ্টি-পাথরের বিরাট খণ্ড ছিল। দেবকীর সন্তানদের ঐ পাথরে আছড়ে মারবার জন্যে রাখা ছিল। যোগমায়াকে নাকি ঐ পাথরেই আছড়ে মারার চেষ্টা করা হলে তিনি শঙ্খচিল হয়ে উড়ে যাবার সময়ে বলে গেলেন কংসকে —"তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"। প্রতাপাদিত্য যখন মথুরায় গিয়েছিলেন ঐ পাথরটি এনে তার থেকে কালীমূর্তি করে যশোরেশ্বরী নামে নিজের রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই পর্যন্ত বলে ভট্টাচার্য আমার দিকে ফিরে বললেন—আপনি জানতেন এ গল্প?

আমি বললাম—এ গল্প অল্প-বিস্তর সবাই জানে। একটা ভ্রমণ কাহিনীতে এরকম একটি গল্প পড়েছিলাম বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি একটা আরও অন্য ঘটনা পেয়েছিলাম একটা প্রামাণ্য বই থেকে।

ভট্টাচার্য বললেন—বলেন কি? এই দেবীর দু'তিন রকম ইতিহাস আছে নাকি? সেটা কি শুনি?

বললাম—আপনি যেটা বললেন একদল ঐতিহাসিক সেটা স্বীকার করেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক বলেন যে, এ মূর্তি শ্রীপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়ের শিলাময়ীর। মানসিংহ শিলাময়ীকেই নিয়ে এসেছিলেন। আসল যশোরেশ্বরীর বিগ্রহ এখনও বাংলাদেশে ঈশ্বরীপুরে নাকি আছে। আর একটি কথা, যে বইতে এই খবরটি পেয়েছিলাম সেই বইতে যশোরেশ্বরীর একটি অদ্ভুত খবরও পেয়েছিলাম।

ভট্টাচার্য বললেন—বাঃ! সেটা বলুন।

বললাম—চলুন, আগে মাকে দর্শন করে আসি, তারপর ধীরে সুস্থে সব বলব।

আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। কি সুন্দর শ্বেত পাথরের মন্দির। কষ্টি-পাথরের মায়ের মূর্তিটি ততোধিক সুন্দর। আমাদের কালীমূর্তির ধারণার সঙ্গে এ মূর্তি মিলবে না, এ মূর্তি "করাল বদনা····· মুক্তকেশী চতুর্ভুজা" নয়। জিভ বার করা নয়। অষ্টভুজা এবং বস্ত্র অলংকারে সুন্দর

ভাবে ঢাকা। মায়ের পায়ের নীচে কিন্তু শিবকে দেখতে পেলাম না। যে প্রকোষ্ঠে মা রয়েছেন তার প্রবেশপথের দু'পাশে নানা রঙের পাথরের দু'টি কলাগাছ। বড় বড় একাধিক পাতাযুক্ত কলাগাছ। তাতে ফলেছে আবার দু'কাঁদি কলা। কলা পাতার ওপর সমান্তরাল রেখাগুলো পর্যন্ত বাস্তব! এমন বাস্তব শিল্পকাজ আমি জীবনে দেখি নি। রুমীও ছ্যাখে নি একথা স্বীকার করল। যেন থ্রি-ডাইমেন্‌সনাল রঙিন ফটোগ্রাফ। ভট্টাচার্য বললেন, কলাগাছ দুটিও নাকি মানসিংহের আমলে করা।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পাশের পথটা দিয়ে আরও ওপরে উঠতে লাগলাম। এবার প্রাসাদ দেখার পালা। প্রাসাদের প্রধান প্রবেশপথের নাম গণেশ পোল। সবই নবাব-বাদশাদের অনুকরণে পরিকল্পনা। সেই দেওয়ান-ই খাস, সেই অজস্র ক্ষুদে ক্ষুদে আয়না দিয়ে করা শিশ্‌মহল, যার ভেতরে একলা আমি অনেকগুলো হয়ে প্রতিফলিত হই। এমন কি প্রাসাদের দেয়ালে যে নকশা করা আছে সেগুলো পর্যন্ত মোগল ঢঙের। সব নকশা বা প্যাটার্নের সঙ্গে স্থান পেয়েছে সুরার পাত্রর ডিজাইন। রাজস্থানে যে দীর্ঘকাল থেকেই ভালভাবে আসবের প্রচলন ছিল এই ডিজাইনই তার প্রমাণ। সুরাপাত্রর নকশা রাজস্থানী শিল্পের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন—যশোরেশ্বরী বিষয়ে কি বলবেন বলেছিলেন ?

বললাম—হ্যাঁ বলছি। একদল ঐতিহাসিক বলেন প্রতাপাদিত্য মথুরা থেকে কষ্টি-পাথর নিয়ে গিয়ে যশোরেশ্বরীর মূর্তি করেন। কিন্তু একটি প্রামাণ্য বইতে পেয়েছিলাম—শ্রীপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়ের শিলাময়ী দেবীকেই মানসিংহ এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিকরা একমত। মনীষি যদুনাথ সরকার একখানি প্রাচীন ফারসী পুঁথির সাহায্যে প্রমাণ করেন মানসিং-এর হাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ঘটে নি। তাঁর মতে আকবরের রাজত্বকালে (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে) মানসিং বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ পদে বহাল থাকেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হওয়ার পরও কিছুদিন মানসিংহ স্বপদে বহাল ছিলেন। কিন্তু ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দিন মানসিংহের পরিবর্তে বাংলার সুবাদার হলেন। সুতরাং মানসিংহের হাতে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় হলে তা ঐ সময়ের মধ্যেই হত। কিন্তু তা হন নি। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতাপাদিত্য বেঁচে ছিলেন। ঐ সময়ে বাংলার নতুন সুবাদার হয়েছিলেন ইসলাম খাঁ। বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে ইসলাম খাঁ সেনাপতি এনায়েৎ খাঁকে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে পাঠালেন। অনেক সংগ্রামের পর কাগরঘাটা নামে এক জায়গায় এনায়েৎ খাঁর হাতে প্রতাপ বন্দী

হলেন। যশোর রাজ্য মোগলদের কবলে চলে গেল। বন্দী প্রতাপাদিত্য চালান হলেন আগ্রায়। পথেই কাশীতে তাঁর মৃত্যু হল। এখন যে ব্যাপারটি বলব সেটি বেশ অদ্ভুত। ঐ বইতে ঘটনাটা পেয়েছিলাম।

ভট্টাচার্য আমার কথায় খুব উৎসুক হয়েছেন। আমি বলতে লাগলাম—

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র প্রতাপাদিত্য রাজ্যকে আরও সুরক্ষিত করতে মন দিলেন। তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ দিকে ধূমঘাট বলে একটি জায়গায় দুর্গ তৈরীর কাজে হাত দিলেন। কমল খোজা নামে একজন খুব বিশ্বস্ত সেনাপতির ওপর ভার দিলেন ঐ দুর্গ নির্মাণের। দুর্গ তৈরীর কাজ চলতে লাগল। একদিন কমল খোজা দেখল একটু দূরে অরণ্যের একটা জায়গা থেকে প্রচুর আলো বেরোচ্ছে। কমল খোজা প্রতাপাদিত্যকে খবরটি দিল। প্রতাপাদিত্য তখন অরণ্য কাটতে কাটতে আলোর উৎসে গিয়ে দেখলেন একটি সুন্দর কষ্টি-পাথরের কালীমূর্তি। সেই মূর্তিকে রাজধানী যশোরে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠিত হলেন যশোরেশ্বরী। কথিত আছে এর পর থেকে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে খুব শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। শৌর্যে-বীর্যে প্রতাপাদিত্য হয়ে উঠলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবি ভারতচন্দ্র তাই লিখেছিলেন—"বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর"। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, প্রতাপাদিত্যের সাহায্যার্থে স্বয়ং ভবানী আবির্ভূত হয়েছেন। প্রবাদ, দেবীর মূর্তি জ্বালাময়ী বলে মন্দিরের ছাদ থাকত না। ছাদ ফেটে যেত। সেইজন্যে মন্দিরের ছাদ ফাঁকা রাখা হয়েছিল।

ভট্টাচার্য একমনে শুনলেন আমার কাহিনী। রুমীও শুনল। সে অকপটে স্বীকার করল এ কাহিনী তার কাছে নতুন।

ভট্টাচার্য বললেন—ভবানীর বরপুত্র ছিলেন প্রতাপাদিত্য, তবুও তাঁর কপাল ভাঙল কেন?

বললাম—প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বিরাট। তবে তাঁর পতনের কারণ নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা আপনাকে বলতে পারি। ইংরেজী প্রবাদ আছে না Pride hath its fall? এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। অহমিকায় প্রতাপাদিত্য যখন বেহুঁশ তখন একদিন মত্তাবস্থায় একটি অসহায় নারীর স্তন ছেদনের হুকুম দিলেন। এই সময়ে সেই জায়গায় প্রতাপাদিত্যের কন্যা এসে হাজির। প্রতাপাদিত্য বিরক্ত ও ক্রোধের বশীভূত হয়ে মেয়েকে বললেন—আমার রাজ্য থেকে তুই দূর হয়ে যা। মেয়ে 'তথাস্তু' বলে চলে গেল। আসলে কন্যার বেশে এসেছিলেন মা ভবানী। প্রতাপাদিত্যের অহংকারের জন্যে অনেকদিন থেকেই মা ভবানী প্রতাপাদিত্যকে ছেড়ে যাবেন মনে করছিলেন, কিন্তু একটা কারণ চাই। এখন সেই কারণ পাওয়া গেল। রাজা নিজেই যশোরেশ্বরীকে তাড়িয়ে

দিলেন। পরদিন প্রতাপাদিত্য ভবানী মন্দিরে গিয়ে দেখলেন কালীর মুখ সত্যি ঘুরে গেছে, দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিম দিকে হয়ে গেছে। তারপর থেকেই নাকি প্রতাপাদিত্যের পতন শুরু হয়।

অম্বরে কালীমন্দির এবং দুর্গের মধ্যে পরিত্যক্ত প্রাসাদের কিয়দংশ ছাড়া বিশেষ কিছু দেখবার নেই। ভট্টাচার্য বললেন—এবার আমরা ফিরব।

গাড়ির দিকে এগোবার তোড়জোড় করছি, রুমী হঠাৎ বলল—আমেরে আর একটা বিখ্যাত মন্দির আছে, জগৎ শিরোমণি মন্দির, একটা গাইড বইয়ে দেখেছিলাম। সেটা কোথায়?

ভাণ্ডারী কথা বললেন এতক্ষণ পরে। বললেন—হ্যাঁ, একটা মন্দির পেছন দিকে আছে বটে, তার কথা বলছেন?

রুমী বলল—চলুন তো দেখি। সেই মন্দিরের ছবি দেখেছি। মন্দিরটা দেখলেই চিনতে পারব।

আমরা যেদিক দিয়ে দুর্গে ঢুকেছিলাম প্রান্তর পার হয়ে চলে গেলাম তার বিপরীত দিকে। আর একটা দেউড়ি পার হয়ে পেছন দিকে এসে হাজির হলাম। সেখানে আর এক দৃশ্য। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখতে পেলাম নীচে জঙ্গলাকীর্ণ প্রাচীন অম্বর নগরের শেষাংশ। অনেক ঘর-বাড়ি, তোরণ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে; কোনটি বা পাহাড়ের ওপর। কিন্তু সবই ভগ্ন এবং পরিত্যক্ত। এই অবস্থায় আগের সমৃদ্ধ অম্বর নগরকে কল্পনা করা যায় না। নীচেই কিছুদূরে একটি মন্দির দেখা গেল। রুমী বলল—ঐটিই বোধ হয় জগৎ শিরোমণি মন্দির।

মন্দিরের সামনে আমরা এসে উপস্থিত হলাম। মানসিংহের তৈরী নারায়ণের মন্দির। বিচিত্র আকারের শ্বেত পাথরের মন্দির। কিছুটা জৈন মন্দিরের প্রভাব আছে। প্রবেশ-পথের ডান দিকের প্রকোষ্ঠে আছে গরুড়ের মূর্তি, বাহনকে দেখলেই বোঝা যায় মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা কে।

মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভেসে উঠল মনের পর্দায় অতীতের এক করুণ ইতিহাস। মানসিংহের ছেলে জগৎসিং বাবার মত বীর হয়ে উঠেছে। একের পর এক দেশ জয় করে ফিরছে, অবশ্য সবই সম্রাটের জন্যে। জাহাঙ্গীর তখন সম্রাট। কিন্তু হলে হবে কি? জাহাঙ্গীরের সন্দেহ হল ছেলে যেমন বীর ও রণকুশলী হয়ে উঠেছে তাতে হয়তো কোনদিন দিল্লীই দখল করে ফেলবে। কিন্তু মিথ্যেই তাকে সন্দেহ করেছিলেন। সে ছিল অত্যন্ত সরল ও বিশ্বস্ত। যাই হোক, সম্রাট দিল্লীর সিংহাসন রক্ষার জন্যে একটা অদ্ভুত ও গর্হিত কাজ করে বসলেন। মানসিংহের ছেলে যখন তাঁর জন্যেই যুদ্ধ করে বিশ্রাম করছে, তখন এক-জন বিরাট থালাতে করে একটি লোহার বর্ম এনে বলল, এটি দিল্লীর

তখৎ-ই তাউস্ থেকে এসেছে, সম্রাট স্বয়ং তরুণ বীরের বিজয়োপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন, এখনই যেন পরিধান করেন। তরুণ বীর দারুণ খুশী হল —সম্রাট স্বয়ং বর্মটি উপহার পাঠিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সম্মান রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ সে পরে ফেলল। কিন্তু কুমার তো জানত না কী ভীষণ নিষ্ঠুরতা তার সঙ্গে সম্রাট করেছেন! তীব্র বিষ মাখান ছিল পোশাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীর কিশোর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। মানসিংহ যখন ঘটনাটা জানলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মানসিংহ তারপর পুত্রের স্মৃতি রক্ষার জন্যে নির্মাণ করালেন এই জগৎ শিরোমণি মন্দির। ভেতরে রাখলেন নারায়ণের মূর্তি। নগরবাসীরা আসত পুজো দিতে, উপাসনা করতে। মানসিংহ স্বয়ং দুবেলা আসতেন এই মন্দিরে। বিগ্রহ দর্শন না করে জল খেতেন না। রুমী বলল—আমি পড়েছিলাম জাহাঙ্গীর জগৎসিংহের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের জামাইকে কেউ মারে?

হেসে বললাম—মধ্যবিত্তরা কেউ মারে না। রাজা-বাদশারা স্বার্থ রক্ষার জন্যে সব কাজ করতে পারে। অবশ্য জগৎসিংহের মৃত্যুর ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা এক মত নন। কেউ কেউ বলেন অতিরিক্ত মদ খাওয়ার জন্যে নাকি তার মৃত্যু হয়েছিল।

যে দিকটা জগৎ শিরোমণি মন্দির সে দিকটায় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অনেক ছোট ছোট বাড়ি, গরিব কিছু লোকেরা সেখানে বাস করে। স্থানীয় লোকের কাছ থেকে একটা মজার খবর পেলাম। আমেরে বাড়ি তৈরি করতে নাকি বিশেষ খরচ নেই। কি ব্যাপার? ওখানে জমি সব পাহাড়ে। কে কেনে কার পাহাড়! সেইজন্যে পাথরের লাইন দিয়ে যে আগে কোন অংশটা ঘিরে দখল নিয়ে নেবে জায়গাটা হয়ে যাবে তার। তারপর একদিন কিছু মজুর লাগিয়ে পাহাড় থেকে পাথর কেটে এনে বাড়ি তৈরি আরম্ভ করলেই হল। জমির জন্য টাকা খরচ নেই, পাথরের জন্যেও নয়। কারণ পাহাড় থেকে যত খুশী পাথর নাও। খরচ কেবল মজুরদের জন্যে। তবে যদি কেউ ইঁটের বাড়ি করে তার খরচ অনেক। তাই এখানে প্রায় সবই পাথরের বাড়ি! এখন অবশ্য অনেকে ইঁটের বাড়ি করছে। এর কারণ পাথরের বাড়িকে ইচ্ছে মত আকার দেওয়া যায় না। তাই কি রকম কাঠখোট্টা লাগে, একনজরে মনে হয় বাক্স বাক্স! কিন্তু ইঁট দিয়ে করলে এ অসুবিধা নেই।

অম্বর দেখা শেষ হলে মাওটা হ্রদের পাশ দিয়ে আমাদের মোটর নেমে এসে ডান দিকে ঘুরে আবার জয়পুরে ফিরে চলল। পথের বাঁ দিকে পড়ল রাজপুত রানীদের সমাধিক্ষেত্র এবং একটু এগিয়েই ডানদিকে রাজাদের

সমাধিক্ষেত্র। এদের বলা হয় "গৈতর"। এখানে আছে পাথরের চত্বর এবং সুন্দর সুন্দর কাজ-করা থাম ও খিলানের ওপর উঁচু দরের গম্বুজ।

দেখতে দেখতে আমরা জয়পুরে এসে গেলাম। অম্বর দেখতে সময় লেগেছে অনেক। এখন বেলা প্রায় বারোটা। রোদ্দুরের তেজ বেড়েছে। রুমীর ইচ্ছে সিটি প্যালেসটা দেখে ফেরে। আমি ওকে বললাম—দেখ, ভাণ্ডারী এবং ভট্টাচার্য আমাদের সঙ্গে সকাল থেকে ক্রমান্বয়ে ঘুরছেন। এটি ওঁদের উদারতা এবং আতিথেয়তা সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখ। আমাদের যে উৎসাহ রয়েছে অতটা উৎসাহ ওঁদের না থাকাই স্বাভাবিক। আর সিটি প্যালেস দেখতে কম করেও একটি ঘণ্টা লাগবে। সিটি প্যালেসের সামনেই আছে 'যন্তর-মন্তর'। সেটি শুনেছি ভারতের ভেতর, শুধু ভারত বলি কেন, সে সময়ে এশিয়ার ভেতর, সেরা যন্তর-মন্তর বা মানমন্দির ছিল। সেটি দেখতেও কিছু সময় লাগবে। আমাদের ফেলে ওনারা যেতে চাইবেন বলে মনে হয় না। আমাদের তৃপ্তির জন্যে ওনাদের আটকে রাখা কি ঠিক হবে? তার থেকে একটা কাজ করি।

রুমী অন্যমনস্কভাবে বলল—কি?

বললাম—এখন হোটেলে ফিরে যাই। ওবেলা আবার বেরোব, ওনাদের বরং কৌশলে ওবেলা ছুটি দিয়ে দেব, কেমন?

আমাদের গাড়ি যখন সিটি প্যালেসের পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন ভাণ্ডারী বললেন—প্যালেস দেখবেন না? ওর সামনেই আছে যন্তর-মন্তর।

আমি বললাম—এবেলা থাক ভাণ্ডারীজি। শরীরটা একটু খারাপ লাগছে। হোটেলে ফিরে বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করছে।

আমার কথা প্রায় শেষ করতে না দিয়ে ভট্টাচার্য বলে উঠলেন—এই বয়সে এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমার মত বয়সে কি করবেন মশাই?

হেসে বললাম—একদম আর নড়তে পারব না।

আমাদের হোটেলে ফেরবার পথেই ভট্টাচার্যের বাড়ি। জহুরী বাজারে নেমে বাঁদিকে একটা সরু গলি, তার মাঝপথে ওনার বাড়ি। সেখানে ভট্টাচার্যকে নামিয়ে দিলাম। সেই সময়ে কৌশলে তাঁকে বলে দিলাম—আপনি আমাদের সহায়তা করতে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, এখন গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। বিকেলবেলা পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে আমাদের জন্যে আর বেরোতে হবে না।

ভাণ্ডারীজীকেও বিনয়ের সঙ্গে প্রায় একই কথা বললাম। ভট্টাচার্য জেনে নিলেন জয়পুরে ক'দিন আছি। তারপর বললেন—আবার দেখা হবে।

ভাণ্ডারীজী নামতে চাইলেন আজমীর গেটের সামনে। সেখানে তাঁকে নামিয়ে দিলাম। ভাণ্ডারী বিদায় নেবার সময় বললেন—ব্যবসার কাজে আজ রাত্রের গাড়িতে দিল্লী যাচ্ছি, কয়েকদিন সেখানে থাকতে হবে। কাজেই ফিরে এসে হয়তো আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর জন্যে অবশ্য আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। ভট্টাচার্যকে বলে যাব, দরকার হলে তাকে পাবেন। আচ্ছা চলি, আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।

ভাণ্ডারীকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। সেই সঙ্গে আমাদের ঠিকানা দিয়ে দিলাম, বলে দিলাম কলকাতায় গেলে যেন অতি অবশ্য করে ঐ ঠিকানায় ওঠেন।

সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন ভাণ্ডারী। ভাণ্ডারীর মত ক'জন লোক দেশে আছেন? কি স্বার্থ ছিল ভাণ্ডারীর আমাদের আগলাবার! কিছুই না। ব্যক্তিগত স্বার্থ কিছুই না, কেবল সতর্কতা। আমরা বিদেশী, ওনাদের দেশের যেন বদনাম না হয়। অথচ ভাণ্ডারীর দেশ জয়পুর নয়, বিকানীর। তবুও যেহেতু তিনি রাজস্থানী সেইজন্যে রাজস্থানের সুনাম রক্ষার দায়িত্ব ভাণ্ডারীর মত নাগরিকের আছে বৈকি!

হোটেলে ফিরেই রুমী তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে দৌড়াবার তোড়জোড় করছে দেখে বললাম—একটু গায়ের ঘামটা মেরে নাও। এখনই গায়ে জল ঢেল না, সর্দি লেগে যাবে।

রুমী আঁচলে ঘাম মুছে বলল—অক্টোবর মাসেও রাজস্থানে কি রকম গরম দেখেছ? ইচ্ছে করছে এখনই হুড়-হুড় করে গায়ে জল ঢেলে ফেলি।

আমি পাখা চালিয়ে জামার বোতাম খুলে দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলাম। রুমী একটু বসে বাথরুমে গেল। বলল—আমি তাড়াতাড়ি সেরে নিই। তারপর তুমি যাবে।

আমি হেসে বললাম—তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারবে? মেয়েদের দু'টি জায়গায় রাজত্ব পাতা আছে—একটি রান্নাঘরে, অপরটি বাথরুমে। এই দু' জায়গায় গেলে তারা সহজে সিংহাসন ছাড়তে চায় না।

আমাকে নীরবে একটু শাসন করে বাথরুমে রুমী ঢুকে গেল।

রুমী সত্যি সত্যি খুব তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে বেরিয়ে এল। বলল—তুমিও দেরি করবে না একদম। বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে। বেয়ারাকে ভাত দেবার জন্যে বলে দি।

এই বলে সে দেওয়ালের কলিং সুইচের দিকে এগোল।

বাঙালীর অভ্যাস, স্নান করে পেট ভরে খেলেই বিছানা তাকে যাদুর মত টানে। ঘুম পাড়িয়ে ফেলে। আমার ঘুম কিছুক্ষণ পরেই ভাঙল। কিন্তু

রুমী তখনও ভীষণ ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকতে মায়া লাগল। দম দেওয়া পুতুলের মত ও ঘুরতে চায়, কিন্তু ওর নড়াচড়া করবার স্প্রীংটা এত একটুখানি, এক কথায় দম ফুরিয়ে যায়। হাতঘড়ির দিকে দেখলাম—তিনটে। বাইরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কাজেই সিটি প্যালেস দেখবার প্রোগ্রামটা কাল সকালের জন্যে তুলে রাখলাম। রুমী ঘুম থেকে উঠুক। জয়পুরে দেখবার আরও অনেক কিছু আছে। তাদের মধ্যে কি কি দেখা যায় ঠিক করে নেব। বিকেলে সেইগুলোই দেখব। কত সময় কেটেছে জানি না, বিকালে যা-যা দেখা যেতে পারে তার জন্যে নোট-বইতে চোখ বোলাচ্ছিলাম। এক সময়ে দেখি রুমী উঠে পড়েছে। উঠেই বলল—ওমা! চারটে বেজেছে, আমাকে ডাক নি কেন?

বললাম—তুমি এত গাঢ় ঘুমোচ্ছিলে যে ডাকতে মায়া হল।

রুমী বলল—আশ্চর্য! আমার যখন ঘুম ভেঙেছিল তখন প্রায় আড়াইটে, দেখলাম তুমি অঘোরে ঘুম দিচ্ছ। ডাকতে মায়া হল, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি বললাম—যাক্, আমাদের তাহলে দু'জনেরই দু'জনের প্রতি মায়া আছে?

দু'জনেই হেসে উঠলাম।

যত তাড়াতাড়ি পারা যায় আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে বললাম—রামগড় চল।

জয়পুরের উত্তরে যে রাস্তা অম্বরের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা আবার ধরলাম। একটু গিয়ে ডানদিকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, রামগড় যাবার রাস্তা। জয়পুর থেকে প্রায় মাইল ষোল হবে। কিছু দূর যাবার পরই ধুলোর রাজত্ব শুরু হল। আধ ঘণ্টা ছোটার পর লোকালয় আরম্ভ হল। ড্রাইভার বলল—রামগড় আসছে।

রামগড় এখন একটা গ্রাম। এখানে দেখার মধ্যে বিরাট পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রামগড় প্রাসাদ, আর তার সামনে বিস্তৃত এক হ্রদ। দেখলে বোঝা যায় এ প্রাসাদ বসবাসের জন্যে করা হয় নি, এ বিলাস-রজনীর প্রাসাদ। প্রাসাদের নীচ দিয়ে আছে সুড়ঙ্গ-পথ। সে পথ শেষ হয়েছে কোথায় জানি না, তবে চলে গেছে পেছনের বিশাল পাহাড় আর সীমাহীন অরণ্যের দিকে। একটুখানি গিয়ে রুমী আর যেতে চাইল না। বলল—আমার কি রকম ভয় করছে। পথটা ছাখ, ক্রমেই পাহাড়-জঙ্গলের দিকে চলে গেছে। প্রমোদরজনীতে কি এই লুকনো পথেই নিয়ে আসা হত প্রমোদসঙ্গিনীদের?

হবে হয়তো। সুড়ঙ্গ-পথে আর গেলাম না, ওপরে উঠে এলাম। উদ্যান

পেরিয়ে উন্মুক্ত হ্রদের ধারে এসে বসলাম। জল দেখলেই রুমী আনচান করে, পা ডোবাবে, নয়তো অকারণে খানিকটা জল মুখে চোখে দেবে। প্রাসাদের সুন্দর সিঁড়ি হ্রদের জলে নেমে গেছে। সিঁড়ির একটা ধারে বসলাম। রুমী দেখি জলের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। আমি শুনেছিলাম রামগড় লেকে কুমীর আছে। কোন একটা বড় নদীর সঙ্গে এর যোগ আছে। কুমীর আসে সেই পথে। রুমীকে বললাম সে কথা। রুমী বলল—তবে হ্রদের ধারেই বসব না। জল ছুঁতে না পারলে আমার ভাল লাগে না।

বললাম—চল ঐদিকটা যাই। রামগড়ের ওয়াটার ওয়ার্কস দেখতে পাবে।

রুমীকে দেখালাম বিরাট স্লুইস গেট, অজগরের মত মোটা মোটা পাইপ, জেনারেটার। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় জল যাবার সময়ে কি প্রচণ্ড আওয়াজ! জলের আওয়াজে জেনারেটারের আওয়াজ মিশে এক প্রচণ্ড শব্দ-ব্রহ্মের সৃষ্টি করছে। রুমীকে বললাম যে, এই ওয়াটার ওয়ার্কস্ থেকে জল যায় সমগ্র জয়পুর এবং অম্বরে।

রামগড় থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে একদিকে। ওকে বললাম—সামনে যে রাস্তাটা দেখছ, ওটা কোথায় গেছে জান?

রুমী বলল—কোথায়?

রামগড়ের বিস্তীর্ণ হ্রদের পাড়ে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বিপরীত দিক থেকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যের ছায়া ঘনিয়ে আসছে। প্রকৃতির ক্যানভাসে তখন রামগড়ের ধূসর রঙের ছবি আঁকা চলছে। একটু পরেই রাতের অন্ধকার সব মুছে দেবে। আমরা একটা লোহার রেলিংয়ে ভর দিয়ে রামগড়ের বিলীয়মান ছবি দেখছি।

রুমী বলল—কৈ বললে না, এই রাস্তাটা কোথায় গেছে?

গম্ভীর হয়ে বললাম—ভানগড়।

রুমী আমার কথা শুনে একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। বলল—ভানগড়টা অমন করে বললে কেন?

ভয় ভয় ভাব ওর।

বললাম—চারদিক ছ্যাখ, কি রকম নির্জন, তার ওপর সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভানগড়টা কেন অমন করে বললাম বলব?

রুমী প্রায় আমার গায়ে মিশে যায় আর কি! ওর এই ভয়-ভয় ভাব আমার ভাল লাগে! মেয়েদের ভয় লাগার মধ্যেও কত কমনীয়তা আছে।

অজানা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেছে, তবু সে বলল—বল।

এখানে তো আমাদের লক্ষ্য করবার কেউ নেই, তাই ওকে খুব কাছে থাকবার সুযোগ দিয়ে বললাম—ভানগড়ে শুনেছি ভূত আছে।

রুমী শিউরে উঠে বলল—প্লীজ, বেশী ভয় দেখিয়ে বলবে না।

বললাম—ভানগড়ের গ্রামের লোকেরা বলে, ভানগড়ের ভগ্ন পরিত্যক্ত প্রাসাদে নাকি এখনও মাইফেল বসে। প্রাসাদে আলো জ্বলে না বটে কিন্তু নাচ-গানের ক্ষীণ আওয়াজ নাকি পাওয়া যায়। গ্রামবাসীরা তাই সন্ধ্যের পর আর ওদিকে যায় না।

রুমী বলল—চল, আর এখানে ভাল লাগছে না।

রামগড়ের হ্রদের ধারে সূর্য অস্ত গেছে। রামগড় হয়ে গেছে অন্ধকার। আর দিন কয়েক পরেই কালীপূজো। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণপক্ষের রাত প্রভাব বিস্তার করেছে। কিছু দূরে চালাঘরের চায়ের দোকানে মিটমিটে টেমির আলো চোখে পড়ছে। দু'চারজন লোকও সেখানে বসে আছে দেখা যাচ্ছে। রুমীকে বললাম—চল, ওখান থেকে দু' ভাঁড় চা খেয়ে ফেরা যাক।

আমাদের গাড়ি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর সামনে আলো ঝলমল করে উঠল। জয়পুর শহরে আবার ফিরে এলাম। আসন্ন দেওয়ালীর জন্যে জয়পুরের প্রধান দুটি বাজারকে প্রতিযোগিতা করে সাজান হচ্ছে। বাপু বাজার এবং নেহেরু বাজার এ দুটি বাজারে নাকি আলোকসজ্জা, কেনা-বেচা ইত্যাদি সব ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা লেগে থাকে।

জয়পুরের প্রাচীন শহর এখনও চার দেয়ালের মধ্যে। সেখানে প্রবেশ করবার জন্যে আছে অনেকগুলো তোরণ। আধুনিক জয়পুর বাড়ছে বাইরের দিকে। দক্ষিণ দিকে বাড়বার সুবিধে বেশী, কারণ দক্ষিণ দিক কম পার্বত্য, এবং বাড়ছেও সেই দিকেই। ১৭২৭ সালে সওয়াই জয়সিং অম্বর থেকে জয়পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর নামেই নতুন রাজধানীর নাম হয় জয়পুর। জয়সিং ছিলেন দুজন—মির্জা জয়সিং এবং সওয়াই জয়সিং। সওয়াই জয়সিংহ হলেন জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাত্র তের বছর বয়সে অম্বরের সিংহাসনে বসেন। রাজপুত বংশের একটি বিরল প্রতিভা সওয়াই জয়সিং। যুদ্ধবিদ্যা, নগর পরিকল্পনা, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্য, উপস্থিত বুদ্ধি ইত্যাদি সব মিলে তাঁকে করে তুলেছিল অসাধারণ। জয়সিংকে 'সওয়াই' খেতাব ঔরঙ্গজেবই দিয়েছিলেন। একজন লোকের যতখানি বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকা স্বাভাবিক তার অনেক বেশী নাকি ছিল জয়সিং-এর। এই জন্যে ঔরঙ্গজেব খেতাব দিয়েছিলেন 'সওয়াই', বাংলায় যাকে বলে সোয়া অর্থাৎ পুরো একের ওপর আরও এক চতুর্থাংশ বেশী। রাজপুতেরা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে বীরত্বের জন্যে। কিন্তু জয়সিং ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন তাঁর জ্যোতির্বিদ্যার জন্যে। জয়সিং জ্যোতিষীদের খুব বিশ্বাস করতেন। কোন কাজ আরম্ভ করার আগে

পাঁজি পুঁথি দেখে কাজে হাত দিতেন। সমগ্র জয়পুর শহর নির্মাণ করেছিলেন ঈষৎ লাল রঙে। কথিত আছে, 'সিদ্ধান্ত সম্রাট' গ্রন্থের মতানুযায়ী জয়পুর নগর স্থাপন করে অম্বর থেকে জয়পুরে রাজধানী সরিয়ে আনলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেই সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্রের খুঁটিনাটি শিখে আসবার জন্যে ইমানুয়েল নামে এক পাদরীর সঙ্গে এক পণ্ডিতকে পাঠিয়ে দিলেন এখনকার জ্যোতির্বিদ্যার ইউরোপীয় কেন্দ্রস্থল পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে। পর্তুগালের রাজা খুশী হয়ে কয়েকটা যন্ত্রের সঙ্গে একজন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতকে এদেশে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে জয়সিংয়ের জ্যোতির্বিদ্যা আরও উন্নত ও প্রগাঢ় হবার সুযোগ পেল। তিনি নিজে অনেক নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান সহজে বোঝা যায়। একটা উদাহরণ দিই—আকাশকে ৪৮ ভাগে ভাগ করে প্রায় এক হাজার তারার স্থান নির্দেশ করেছিলেন। এই তারাপত্র এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'যন্ত্রসিংহ কারিকা' নামে একটি বই লিখেছিলেন।

রাত আটটা পর্যন্ত জয়পুরের রাস্তা-ঘাট, দোকান-বাজার দেখে বেড়ালাম। সান্ধ্য চা পান করলাম রামবাগ প্যালেস হোটেলে! পূর্বতন রামবাগ প্রাসাদ এখন হোটেলে পরিণত হয়েছে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে নিরিবিলি উদ্যানে হোটেলটি ছুটি কাটাবার পক্ষে খুব আকর্ষণীয়। কিন্তু খরচ অনেক। আমাদের মত মধ্যবিত্তরা বিশেষ থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজেই আমরা কেবল চা আর স্ট্যাণ্ডউইচ খেয়েই সন্তুষ্ট রইলাম।

রুমীকে বললাম—এখানে দু'একদিন থাকবে নাকি ?

রুমী ঠোঁট উলটে বলল—ভারি পয়সা হয়েছে, না ?

রামবাগ প্যালেস হোটেল সংলগ্ন লনে গোল গোল বেতের চেয়ার-টেবিলে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে রুমী আর আমি কথা বলছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল লম্বা বারান্দার একটি ঘর থেকে গুটিতিনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে মধ্যবয়স্ক এক দম্পতি বেরোলেন। মনে হল বাঙালী। মেয়েদের চোখে কতকগুলো অবস্থা পুরুষদের আগেই ধরা পড়ে। সেই রকম একটা অবস্থা রুমী বোধহয় ধরতে পেরেছে। তাই আমাকে বলল—চেয়ে ছাখ, ওরা এই হোটেলে উঠতে পারে আর আমরা পারলাম না।

রুমীর হঠাৎ কেন এমন পরিবর্তন বুঝতে না পেরে বললাম—তার মানে ?

ও বলল—তার মানে বুঝলে না ? আচ্ছা, তোমার কি ওদের দেখে মনে হয় ওরা রামবাগ প্যালেস হোটেলে উঠতে পারে ?

আমি হেসে বললাম—এ তুমি কি বলছ ? দেখে কি সব লোকের আর্থিক অবস্থা আন্দাজ করা যায় !

রুমী জোর দিয়ে বলল—তুমি আন্দাজ করতে পার না, কিন্তু আমি পারি।

একটু কৌতুক করার ইচ্ছে হল। রুমীকে বললাম—প্রমাণ কর।

ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের অদূরে বসেছেন। রুমী মাঝে মাঝে বড় সাহসী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যেখানে সে জানে তার জয় অবশ্যম্ভাবী সেখানে তো কথাই নেই।

ও উঠে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ জমাল। বেশ ভালই আলাপ জমাল। ওদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসতে লাগল। বুঝতে পারলাম না যা প্রমাণ করবার জন্যে রুমী গিয়ে আলাপ জমিয়েছে তা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে কি করে। এক সময়ে আমায় ডাকল রুমী। উঠে গেলাম। আমার সঙ্গে ভদ্রলোকদের আলাপ করিয়ে দিল। সেই সঙ্গে বেয়ারাকে ডেকে আবার চায়ের অর্ডার দিল। জমে উঠল আলাপ। একথা সেকথার মধ্যে এক সময়ে আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছে গেলাম। ভদ্রলোকই পৌঁছে দিলেন।

ভদ্রলোক খেদোক্তি করলেন—মশাই, ছা-পোষা লোক আমি, রেলে চাকরি করি বলে ট্রেন ভাড়া লাগে না। কিন্তু আর সব খরচই তো লাগে। জয়পুরে এসে কোন হোটেলে জায়গা পেলাম না। অনেক ঘোরাঘুরি করার পর টাঙ্গাওলা এখানে এনে হাজির করল। কাল এসেছি, এখনও চব্বিশ ঘণ্টা কাটে নি, তবে বুঝতে পারছি এখানে থাকা যাবে না। আমাদের মত লোকের থাকবার জায়গা এটা নয়। প্রচণ্ড চার্জ। কাল যেখানে হোক চলে যাব মনে করছি। হোটেলেই যদি সব টাকা দিয়ে দিলাম তো বেড়াব কি?

রুমীর দিকে চোখ পড়তে দেখি তার ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর হাসি। তার অনুমান সত্যি এটা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ভদ্রলোককে বললাম—আপনি রেলে চাকরি করেন, আমার পক্ষে একথা বললে ধৃষ্টতাই হবে, তবুও বলছি, রিটায়ারিং রুমে উঠলেন না কেন?

ভদ্রলোক বললেন—সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে।

তারপর জানি না, ভদ্রলোকরা কোথায় থেকেছেন। কিন্তু জয়পুরে থাকাকালীন আমাদের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

পরদিন সকাল আটটা সাড়ে আটটা হবে। বেরোবার তোড়জোড় করছি। আজ সকালের সূচী হল সিটি প্যালেস এবং যন্তর-মন্তর দেখা। তারপর যদি হাতে সময় থাকে তাহলে মিউজিয়াম দেখব। হোটেল রুমের দরজায় পেলমেটে ভারী পর্দা ঝুলছে। ওপার থেকে ভট্টাচার্যের গলা পেলাম।

—আসতে পারি ?

বললাম—আসুন, আসুন।

ভট্টাচার্য ঘরে ঢুকে আমাদের আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন—ঠিক সময়ে এসে ধরেছি। একটু দেরি হলে আপনাদের পেতাম না। মুশকিলে পড়তাম।

আমি হেসে বললাম—কেন মুশকিলে পড়তেন? আপনাকে না পেলে বরং আমাদের মুশকিলে পড়া স্বাভাবিক।

ভট্টাচার্য বললেন—আমার গিন্নী আপনাদের কথা শোনা অবধি আলাপ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে। ওখানে আজ দুপুরে আপনাদের নেমন্তন্ন। তা এখন বেরোচ্ছেন কোথায় ?

বললাম—সিটি প্যালেস দেখতে যাচ্ছি।

ভট্টাচার্য বললেন—বেশ ! সিটি প্যালেস দেখুন, ওর সামনে আছে যন্তর-মন্তর। এ দুটো দেখতে আপনাদের ঘণ্টা তিনেকের বেশী লাগবে না। কাজেই আমার ওখানে আপনাদের বারোটার মধ্যে আশা করব। কাল আমাকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে? জহুরী বাজারে ঢুকে একটু গিয়ে বাঁ হাতে গলি ?

বললাম—খুব মনে আছে।

ভট্টাচার্য বললেন—আচ্ছা চলুন। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই সিটি প্যালেস। যন্তর-মন্তর দেখিয়ে একেবারে আপনাদের নিয়েই ফিরব।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—আপনি ভাববেন না। পথ-ঘাট আমি একবার দেখলেই চিনে ফেলি। তা ছাড়া এই দেখুন, আমার কাছে জয়পুরের রোড ম্যাপ।

ভট্টাচার্য বললেন—দেখি ম্যাপটা।

আমার কাছ থেকে রোড ম্যাপটা নিয়ে সামনে মেলে ধরলেন। চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—এই হল জহুরী বাজার, আর এই হল আমার বাড়ির গলি। ঠিক এইখানে পৌনে বারোটা থেকে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।

ভট্টাচার্য চলে গেলেন। আমরা গেলাম সিটি প্যালেস দেখতে। প্রাসাদ দেখতে চার টাকা করে টিকিট। অতিরিক্ত মনে হল। কারণ সমস্ত প্রাসাদটা তো দেখা যাবে না। সেখানে এখনও রাজপরিবার থাকেন।

প্রাসাদে প্রথমে যা দেখলাম—রাজপুত রাজাদের পোশাক পরিচ্ছদ, শয্যা দ্রব্যাদি। রাজপুত রাজাদের পোশাক দেখে মনে হয়, হ্যাঁ, তাঁরা প্রকৃত স্বাস্থ্যবান ও বিশালদেহী ছিলেন বটে। কিন্তু রাজপুত রানীরা কি তেমন বিশালদেহী ছিলেন ? অন্ততঃ পোশাকাদি দেখে তো মনে হয় না

ঐ সব রাজাদের রানী হবার মত দেহের অধিকারী ছিলেন। ব্লাউজের ধরনে রানীদের জামা দেখে সময়ে সময়ে মনে হয় বুঝি তাঁরা আমাদের বাঙালী মেয়েদের থেকেও ক্ষীণকায় ছিলেন। মজা লাগল একটা কাঁচের বড় শোকেসের সামনে এসে।

রুমী বলল—ছাখ, একটা কি সুন্দর চাদর! বোধহয় বিছানার। রাজা-রাজড়াদের কাণ্ডই আলাদা, বিছানার চাদর—তাতেই কি রকম শল্‌মাচুমকির কাজ! কিন্তু আশ্চর্য! পায়জামার মত পা রয়েছে কেন?

শোকেসের পাশে দাঁড়িয়েছিল দারোয়ান। সে বললে—ওটা জয়সিং-এর ছেলে সওয়াই মাধো সিং-এর পায়জামা, আর এপাশে আছে জামা।

মাধো সিং ছিলেন বিশালতম রাজপুত। সাত ফুট লম্বা এবং চওড়া চার ফুট। এই লোক যখন ঠিক ঠিক সাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে বার হতেন, তখন তাঁর সামনে কেউ দাঁড়ায় সাধ্য কি! হয়তো বিনাযুদ্ধেই তাঁর জয়লাভ হয়ে যেত। আর এক পাশে দেখলাম মাধো সিং বসতেন যে গদিটায়। যেমন মোটা তেমনি বড় তাকিয়া ও পাশবালিশ।

রুমী বলল—এ যে দেখছি আমাদের মত জন ছয় সাত লোকের বসবার আসর!

রুমীকে বললাম—তোমার মনে পড়ে, আলোয়ারের কাছে শিলিসের দেখার সময়ে গাইড যখন আমাকে রাজা মঙ্গলসিং-এর ঘটনা বলছিল তুমি তখন তার অলক্ষ্যে একবার মঙ্গল সিং-এর লাল ভেলভেট মোড়া সিংহাসনটায় একটু বসে নিয়েছিল?

রুমী বলল—হ্যাঁ, একটা সাধ মিটল।

আমি বললাম—আমার সাধ তোমাকে পাশে নিযে মাধো সিং-এর এই জায়গাটায় বসি।

রুমী বলল—তোমার সাধ আমি মেটাতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত।

বললাম—কি?

ও হেসে বলল—মাধো সিং-এর মত মোটা হতে হবে।

রুমীর কথা শুনে বললাম—আমি যদি ঐরকম অস্বাভাবিক বপুর অধিকারী হই তুমি কি তা সহ্য করতে পারবে? পৃথুলা রমণীরা যেমন পুরুষদের কাছে আকর্ষণহীন তেমনই পৃথুল পুরুষদের রমণীরা সহ্য করতে পারে না।

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম।

দ্বিতীয় প্রবেশ আমাদের হল অস্ত্রাগারে। সিটি প্যালেসের অস্ত্রাগার, নাম 'শিলেখানা'। প্রবেশদ্বারের মাথায় ছোট বড় নানারকম অস্ত্র দিয়ে ইংরেজীতে লেখা আছে 'শিলেখানা'। সংগ্রহশালায় এত রকম অস্ত্র আছে

যে তাদের কি ভাবে ব্যবহার করা হত বোঝা মুশকিল। আধুনিক অস্ত্রবিদ্যায় যাঁরা পারদর্শী তাঁরা হয়তো কিছুটা বুঝলেও বুঝতে পারেন। তবে আমি অস্ত্রানভিজ্ঞ লোক হলেও বুঝতে পারলাম—অস্ত্র ও শস্ত্র যাতে একই সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তেমন ভাবে কিছু তৈরি করা হয়েছিল প্রাচীনকালে। ছোরা এবং তার হাতলের উভয় পাশে ছোট ছোট পিস্তল। রুমীকে সেইগুলো দেখিয়ে বললাম—অস্ত্রশস্ত্র এক সঙ্গে করা হয়েছিল এইগুলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রুমী বলল—সে আবার কি? অস্ত্র আর শস্ত্র সমার্থক নয়?

বললাম—দুটিই আয়ুধ। সে হিসেবে তুমি সমার্থক বলতে পার। কিন্তু অমরকোষে পেয়েছিলাম, যা ছুঁড়ে মারা যায় তাই অস্ত্র, আর যা আয়ত্তে রেখে চালনা করা যায় তা হল শস্ত্র।

এবার আর একদিকে গেলাম। সেখানে কেবল বন্দুক। বন্দুকগুলো এখানকার নয়। বন্দুক-শিল্পের গোড়ার দিকের বন্দুক। এক একটা নল আট ফুট দশ ফুট। সেই অনুযায়ী কিন্তু ঘোড়া এবং বাঁট নয়। তারা এখনকার বন্দুকের ঘোড়া এবং বাঁটের মতনই প্রায়। এত লম্বা নলওলা বন্দুক একজনের পক্ষে ছোঁড়া অসম্ভব।

রুমী বলল—একজনের কাঁধে নলটা না রাখলে ছোঁড়া যাবে না এদের। পরের কাঁধে রেখে বন্দুক ছোঁড়া কথাটা বোধ হয় এই থেকেই এসেছে।

বললাম—যা বলেছ। অনেকে বলে প্রবাদ প্রবাদই। কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রত্যেক প্রবাদের উৎস আছে একটা।

রুমী স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল—উদাহরণ?

বললাম—এই তো মুশকিলে ফেললে। আচ্ছা দাঁড়াও, এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে বলি। চোরে চোরে মাসতুত ভাই প্রবাদটা কি করে হল জান?

রুমী বলল—না।

গল্পটা বললাম—এক গ্রামে চারটে চোর চুরি করতে বেরিয়েছে। অনেক জিনিস চুরি করেছে। কিন্তু ভোর হয়ে গেছে। চোরাই মালগুলো কি করে নিয়ে যায়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। একটা খাটে জিনিসগুলো এমনভাবে সাজিয়ে একটা সাদা চাদর ঢেকে দিল যেন মড়া বলে মনে হয়। ব্যস, লোকে আর সন্দেহ করবে না। এদিকে হয়েছে কি, অন্য আর একটা চোর চুরি করতে বেরিয়েছিল। ভোর হয়ে গেছে, দেখল দূরে চারজন শবদাহী আসছে। 'হরিবোল' না দিয়ে বলতে বলতে আসছে—'বাপ্ মরল রে বাপ্'। যাই হোক, এই চোরটা পাশে একটা গাছে উঠে লুকিয়ে রইল। ক্রমে 'বাপ্ মরল রে বাপ্' বলতে বলতে লোকগুলো মড়া

নিয়ে গাছের নীচ দিয়ে চলে যেতে লাগল। নড়া-চড়াতে বোধহয় চাদরটা একটু সরে গিয়েছিল। গাছের ওপর থেকে চোরটা দেখতে পেল চাদরের ফাঁক দিয়ে একটা গাড়ুর নল বেরিয়ে আছে। তখন সে বুঝতে পারল ওরা ওরই সমগোত্রীয়। ওদের কাঁধে বাপের মড়া নয়। শববাহীরা যত বলে 'বাপ্ মরল রে বাপ্' গাছ থেকে শেষের চোরটা বলে—'তোদের গাড়ুর নলটা ঢাক।'

—বাপ্ মরল রে বাপ্।

—তোদের গাড়ুর নলটা ঢাক্।

শববাহী দেখল তাদের কেরামতি ধরা পড়ে গেছে, পঞ্চম চোর ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। পঞ্চম চোরকে তখন ডাক দিল—'ওহে, ভাগ নেবে তো এসো'। পঞ্চম চোর আর ঝামেলা করল না, গাছ থেকে নেমে ওদেরই যেন একজন হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলল আর বলতে লাগল—'কবে মরল রে মেসো?' অর্থাৎ আগেকার চোরগুলোর সঙ্গে এই চোরটা মাসতুতো ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলল।

আমার গল্প শুনে রুমী এমন খিলখিল করে হেসে উঠল যে শিলেখানার দরোয়ানজী হঠাৎ চমকে উঠল।

মানসিং যে তরোয়ালটি ব্যবহার করতেন সেটি দেখিয়ে রুমীকে বললাম—এ তলোয়ারটার কত ওজন হবে আন্দাজ করতে পার?

রুমী বলল—বলা কঠিন।

বললাম—সাড়ে পাঁচ সের।

শিলেখানা থেকে বেরোবার সময়ে দেখলাম দরজার মাথায় নানারকম ছোট বড় অস্ত্র দিয়ে লেখা—'Good bye.'

রুমী বলল—এবার কি দেখব?

বললাম—সিটি প্যালেস একটা ছোটোখাটো নগর মনে হলেও এখানে বেশী ঘোরবার বা দেখবার সুযোগ পাবে না, কারণ, রাজবংশের লোকেরা এখনও এখানে বাস করেন বলে প্রাসাদের বেশীরভাগই দর্শকদের কাছে রুদ্ধ। ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে, চল গোবিন্দজীর মন্দিরে যাই।

প্রাসাদের একধারে গোবিন্দজীর সুন্দর মন্দির। একটি রম্য উদ্যান পার হয়ে যেতে হবে মন্দিরে। এই গোবিন্দজীকে আনা হয়েছিল বৃন্দাবন থেকে। ঔরঙ্গজেব এককালে আদেশ দিয়েছিল মথুরা-বৃন্দাবনের দেববিগ্রহ ধ্বংস করবার জন্যে। সেই সময়ে সওয়াই জয়সিং গোবিন্দজীকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিজের প্রাসাদে। এ ইতিহাস ভট্টাচার্যের কাছে হোটেলে আগেই আমরা শুনেছি।

গোবিন্দজীর মন্দিরের সামনে এসে একটা শোনা কাহিনী মনে পড়ল।

বিশ্বাস অবিশ্বাস শ্রোতাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। রুমী কাহিনীটা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তবুও বললাম—সওয়াই জয়সিং-এর কন্যাকে নিয়ে কাহিনী। রুমী ইতিহাস পছন্দ করে। সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রচলিত কাহিনীও শুনতে ভালবাসে। বললাম কাহিনীটা।

—জয়সিং-এর কন্যার জন্ম এক পুণ্য ক্ষণে। রাধিকার অংশে নাকি জন্ম। মেয়ে যত বড় হয় তত মেয়ের হাবভাব কি রকম যেন মনে হয়। চুপচাপ থাকে, সর্বদা ভাবে বিভোর। রাজা ভাবলেন, মেয়ের বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সওয়াই জয়সিং-এর মেয়ে অপূর্ব রূপ-গুণবতী। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে রুচি নেই। যার রাধিকার অংশে জন্ম তার স্বামী কি সাধারণ মানুষ হতে পারে? কৃষ্ণ ছাড়া কে হবে তার নাথ? জয়সিং এত জানতেন না। যাই হোক, বৃন্দাবন থেকে গোবিন্দজীকে আনার পর থেকে জয়সিং লক্ষ্য করলেন মেয়ের ভাবান্তর ঘটেছে। ভাবলেন মেয়ে সাধন-ভজন নিয়ে থাকতে চায়। আর কি করা যাবে? থাকুক তবে সাধন-ভজন নিয়েই। কিন্তু একি! কন্যার ঘরে কি নিভৃতে কেউ আসে? গভীর রাতে কন্যা কার সঙ্গে কথা বলে! হাসে! তবে কি কন্যা·········না, দিন দিন উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে! রাজা কাউকে কিছু না বলে সজাগ থাকলেন। কন্যার বিছানায় কোনদিন ফুল, কোনদিন অলঙ্কার পড়ে থাকে। রাজা নানা সন্দেহে অস্থির হয়ে পড়লেন। অবশেষে রাজা জানতে পারলেন সবই। গোবিন্দজী আসেন কন্যার কাছে। কন্যাকে তিনি সাবধান হতে বললেন। প্রবাদ—কন্যা গোবিন্দজীকে প্রার্থনা জানালে গোবিন্দজী তাকে শ্রীঅঙ্গে লীন করে নেন। শোকগ্রস্ত পিতা জয়সিং তারপর কন্যার একটি সোনার মূর্তি গড়িয়ে গোবিন্দজীর মন্দিরে রেখে দেন। কেউ কেউ বলে ঐ মূর্তি মীরাবাঈ-এর। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা বলে ঐ মূর্তি জয়সিং-দুহিতার।

আমি জানি এ কাহিনী শুনলে বৃদ্ধারা কেঁদে ভাসাতেন। রুমী বৃদ্ধা নয়। তবু তার চোখ ছলছল করছে।

গোবিন্দজীর মন্দির দেখা শেষ হলে রুমীকে বললাম—চল এবার দরবার-কক্ষে।

দরবার কক্ষে ঢুকেই ডান হাতে চোখে পড়বে একটি বিস্ময়কর তৈল-চিত্র। তৈলচিত্রটি জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় মানসিংহের। সবে তিনি দেহ রেখেছেন। কুচবিহার রাজবাড়ির মেয়ে গায়ত্রী দেবীর স্বামী রাজা মানসিং। রাজা মানসিং ছিলেন পাকা পোলো খেলোয়াড়। কিন্তু সেই পোক্ত পোলো খেলোয়াড়ের মৃত্যু হল পোলো খেলতে গিয়েই লণ্ডনে। নিছক একটি দুর্ঘটনা! তৈলচিত্রটি করেছিল ফ্রান্সের একটি স্টুডিও।

—ছবিটির বিশেষত্ব কি ? রুমীকে জিজ্ঞাসা করলাম।

রুমী বলল—তুমি ছবি আঁক, তুমি বলতে পারবে বিশেষত্ব কি।

বললাম—তুমিও তো ছেলেবেলায় ছবি আঁকতে পারতে।

রুমী বলল—সে তো খালি গাছের পাতার ছবি আঁকতে পারতাম।

যদি হাতে সময় থাকত তাহলে রুমীকে বোঝাতাম একটা গাছের পাতা নিখুঁত করে আঁকা কত শক্ত! আকৃতি, শিরা-উপশিরা দিয়ে এঁকে কোন্ গাছের পাতা বুঝিয়ে দেওয়া কত কঠিন। রুমীর আঁকা আমি দেখেছি। সেই কঠিন কাজটা সে পারত কত সহজে।

বললাম—ছাখ কি বিশেষত্ব। চোখের মণি আর যে পা এগিয়ে আছে তার জুতোর সামনেটা ছাখ। ছবিটাকে তুমি যে কোন কোণ থেকেই ছাখ না কেন, দেখবে তোমার দিকেই রাজা তাকিয়ে আছে, আর জুতোটাও তোমার দিকে ফেরান।

বলার পর রুমী নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ছবিটা দেখে বলল—খুব আশ্চর্যের ব্যাপার তো! তুমি এই রকম কায়দায় একটা ছবি আঁকবে ?

বললাম—কলকাতায় ফিরে গিয়ে চেষ্টা করব।

সিটি-প্যালেসের এই সংরক্ষণাগারে আছে অনেক আশ্চর্যের জিনিস। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা এবং এক ইঞ্চি চওড়া একটি কাগজে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতাকে মূল সংস্কৃততেই লিখে রাখা হয়েছে। যেন একটি মিনিয়েচার কোষ্ঠী। কী ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা! খালি চোখে দেখা যাবে না কি লেখা! কোন্ ভাষা। কিন্তু একটি ম্যাগনিফাইং কাঁচ চোখে ধরলে দেখা যাবে পরিষ্কার সংস্কৃততে লেখা হয়েছে সম্পূর্ণ গীতাকে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার অক্ষরগুলো পরিষ্কার। একটি আর একটির গায়ে লেগে যায় নি। কারা লিখেছেন, কি করেই বা লিখেছেন এমন লেখা! যান্ত্রিক পদ্ধতিও এর কাছে হার মানে। মনে পড়ল একদিনের একটি খবরের কথা। রাজস্থানে আসবার কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়েছিলাম। খবরটা হল ব্রিটেন থেকে কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি অভিধান এসেছে। তার অক্ষরগুলো এত ছোট যে অভিধান প্রকাশক প্রত্যেক বই-এর সঙ্গে বিনা মূল্যে পাঠিয়েছেন একটি করে আতস কাঁচ। ভারতীয় কাস্টমস্ বিভাগ মুশকিলে পড়েছেন আতস কাঁচগুলো নিয়ে। বই আসবার অনুমতি আছে। কিন্তু অনুমতি নেই বিদেশী আতস কাঁচ আনবার। সে যাই হোক, আতস কাঁচের জন্যে কাস্টমস্ বিভাগ যা খুশী করুন সেটা তাঁদের ব্যাপার। আমার তখন মনে হয়েছিল একমাত্র যান্ত্রিক পদ্ধতির জন্যেই এমন লেখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এখন গীতা লেখা দেখে সে ভাবনাটি কোথায় উড়ে গেল। যে সময়ে এমন গীতাটি লেখা হয়েছিল সে সালটিকে সযত্নে মনে রাখলাম : ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

বিভিন্ন জিনিস দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। কতগুলো বই, তার প্রত্যেক পাতায় কালোর ওপর সাদা রং দিয়ে নানারকম নকশা আঁকা। কি চমৎকার! কি সিমেট্রিক্যাল! কত রকম প্যাটার্ন। ভাল করে নকশাগুলো দেখতে গিয়ে দেখি, এ তো কালো কাগজের ওপর সাদা রং নয়। এ যে সাদা কাগজকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কেটে নকশা করা! ভারী আশ্চর্য সুন্দর তো! আর একটা ব্যাপার বেশী বিস্ময় জাগায়—নকশাগুলো কোথাও জোড়া নেই। একটি কাগজকেই কেটে কেটে করা। সাদা নকশাকে ভাল করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কালো কাগজের ওপর রাখা আছে। কার করা এমন শিল্পকর্ম? ঈশ্বর সিং-এর।

রুমী বলল—কে এই ঈশ্বর সিং।

বললাম—মাধো সিং-এর বৈমাত্রেয় ভাই। জয়সিং-এর প্রথম ছেলে এই ঈশ্বর সিং। পরে উদয়পুরের শিশোদীয় রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন জয়সিং। শিশোদীয় রাজকন্যা জয়সিংকে বিয়ে করলেন একটি শর্তে যে তাঁর পুত্রকেই জয়পুরের সিংহাসনে বসাতে হবে। সতীনের ছেলে ঈশ্বর সিং পাবে না সিংহাসন।

রুমী জিজ্ঞাসা করল—সে কালেও কি সতীনের ছেলেকে এত হিংসে করা হত?

বললাম—সতীনকে হিংসে করলে তার ছেলের ওপরও হিংসে আসা স্বাভাবিক। মেয়েরা নিজের ভাগটা খুব বেশী বোঝে, তাই না? তুমি কি বল?

রুমীর মনে কি প্রতিক্রিয়া হল জানি না, মুখে বলল—এর মীমাংসা সময় মত হবে। ঈশ্বর সিং-এর কি হল বল।

বললাম—জয়সিং শিশোদীয় রানীর কথায় সম্মত হয়েছিলেন। জয়সিং-এর মৃত্যুর পর মাধো সিং বসলেন সিংহাসনে। রাজ্যে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। এ কি অন্যায় ব্যাপার! বড় ভাই ঈশ্বর সিং থাকতে মাধো সিং কি করে রাজা হয়? কিছুকাল চলল খুব গণ্ডগোল। কিন্তু মাধো সিং অন্য ধাতুতে গড়া। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করলেন না। পথের কণ্টক যাকেই মনে হল তাকে হয় বন্দী নয় হত্যা করলেন। এদিকে ঈশ্বর সিং সর্বদা শিল্পকর্ম নিয়েই থাকতেন নিজের মধ্যে মশগুল। তিনি যখন ব্যাপারটা জানলেন তখন তা গড়িয়ে গেছে অনেক দূরে। কিছু করার নেই। ঈশ্বর সিং-এর সিংহাসন লাভের কোন চেষ্টা নেই দেখে অনেকে নাকি তাঁর ওপর বিরক্ত হয়েছিল! ঈশ্বর সিং জাত-শিল্পী! নন্দন-তত্ত্বের পূজারী, ভাবুক। তিনি কি পারেন কখনও বৈষয়িক লোভী মাধো সিংএর সঙ্গে? তাঁর কোন্ রাজ্য সেটা কেউ বোঝবার চেষ্টা করল না। মাধো

সিং রাজা হল, আর ঈশ্বর সিং দেখলেন, জগতটা দুর্নীতিগ্রস্ত এবং হৃদয়হীন। অবশেষে একদিন ব্যথায়, হতাশায় তিনি আত্মহত্যা করলেন। এক মহান্ শিল্পী মুছে গেল জগৎ থেকে। তাতে মাধো সিং-এর মত লোকের কিছু এসে গেল না। অন্যান্য লোকগুলোও তো বেদরদী। সওয়াই মাধো সিং-এর নামে করেছে রাজস্থানের একটি বিখ্যাত জায়গা—সওয়াই মাধোপুর। কিন্তু ঈশ্বর সিং-এর নামে কি করেছে?

কথা বলতে বলতে কতকগুলো বিরাট তৈলচিত্রের সামনে চলে এসেছি। মাধো সিং-এর ছবিটা খুঁজছিলাম, পেয়ে গেলাম। রুমীকে দেখালাম—এই সেই মাধো সিং! বলে না দিলেও সহজে ধরা যায় কোন্‌টা মাধো সিং-এর ছবি।

রুমী দেখে বলল—যেমন চেহারা তেমনি স্বভাব!

সিটি প্যালেসের অল্প কয়েকটা ঘর দেখবার থাকলেও সেগুলো দেখতে বেশ সময় লাগে। বেরোবার সময়ে সামনের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দিল্লীর দেওয়ান-ই-আমের ঢঙে শ্বেত পাথরের থামযুক্ত একটা চত্বর আছে। বোধহয় এটিও দেওয়ান-ই-আম ছিল। এখানে দু'টি মজার জিনিস দেখলাম—বিরাট বিরাট দুটি রূপোর ঘড়া। আংটাযুক্ত রূপোর ঘড়া। এক একটি ঘড়ার ওজন এগার মণ। শেষ মানসিং-এর পিতামহ এ দুটি ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক। গঙ্গা জলে রান্না হত তাঁর খাবার। গঙ্গা জলে তিনি স্নান করতেন। তিনি বারকয়েক বিলেত গেছেন, কিন্তু গঙ্গা জলে রান্না স্নান বাদ যায় নি। সঙ্গে যেত এই বিশাল দুই ঘড়া। কোথায় জয়পুর কোথায় গঙ্গা! কিন্তু রাজাদের ব্যাপার। থাকুক না গঙ্গা বহু বহু যোজন দূরে, সেখান থেকে জল এনে ভরে রাখা হত এগার মণ ওজনের এই দুটি রূপোর ঘড়ায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সমান উঁচু এক একটি ঘড়া।

হাত-ঘড়ির দিকে দেখে রুমী বলল—মনে আছে তো, পৌনে বারোটা থেকে ভট্টাচার্য আমাদের জন্যে জহুরী বাজারের রাস্তায় অপেক্ষা করবেন?

বললাম—হ্যাঁ, এবার যন্তর-মন্তর দেখে ফিরব চল।

সিটি প্যালেস থেকে বেরিয়ে এলাম। রুমী বলল—জয়পুরে কোন কেল্লা নেই?

তাই তো! জয়পুরের কেল্লাটা কোথায়? ফিরে গেলাম সিটি প্যালেসের প্রবেশদ্বারে যে দারোয়ান আছে তার কাছে। সে দেখিয়ে দিল প্যালেসের পেছন দিকে একটা পাহাড়। দেখলাম, হ্যাঁ, তার ওপর একটা কেল্লা আছে—নাহারগড় কেল্লা।

দরোয়ান বলল—যন্তর-মন্তর থেকে নাহারগড় কেল্লাকে ভাল করে দেখা যাবে।

রুমীকে বললাম—এই যন্তর-মন্তর—এখানে তুমি সব পাবে, সময়, তিথি, রাশি, নক্ষত্র। অনেক পরিশ্রম করে জয়সিং এটি তৈরি করেছিলেন। এটি পৃথিবীর বিখ্যাত মানমন্দিরের একটি।

রুমী বলল—দিল্লীতে যন্তর-মন্তর বলে। এখানে?

বললাম—মানমন্দিরকে যন্তর-মন্তর বলে। কথাটা অবাংলা সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় কবে এ শব্দের জন্ম বলতে পারব না। তবে মনে হয় স্থানীয় লোকেরাই এ শব্দের স্রষ্টা। কাঁটা, গোল ইত্যাদি সব দেখে তাদের মনে হয়েছে যন্তর মানে যন্ত্র; আর মন্ত্রের মত সব কিছু ঠিক ঠিক নির্দেশ করে বলে তাকে মনে হয় বলে মন্তর। সব মিলিয়ে হয়ে গেল যন্তর-মন্তর।

রুমী বলল—এটিও তো সওয়াই জয়সিংয়ের করা?

বললাম - হ্যাঁ, তবে এটি ছাড়াও জয়সিং আরও অনেকগুলো যন্তর-মন্তর নির্মাণের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। সেগুলো আছে দিল্লী, বেনারস, উজ্জয়িনীতে ও মথুরায়।

রুমী বলল—এত পণ্ডিত লোক কিন্তু নতুন এক রানীকে পাবার লোভে ঈশ্বর সিংয়ের মত ছেলের প্রতি অবিচার করলেন কেন?

বললাম—সেই তো হল কথা। রক্ত-মাংসের মানুষ, দোষ-গুণ থাকবেই।

রুমী যেন মরিয়া হয়ে উঠল—তা থাকুক। কিন্তু আমার মনে হয় শিশোদীয় রাজকন্যাকে পাবার জন্য তিনি ক্ষেপে গিয়েছিলেন। একে কি প্রেমিক বলবে, না অন্য কিছু?

বললাম—যা খুশী বলতে পার। তবে কলেজ জীবনে কোথায় যেন একটা কথা পেয়েছিলাম "অল ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালস্‌ আর সেক্‌সুয়ালস্‌"। প্রতিভাবানদের সব ক্ষমতা ও অনুভূতি প্রখর। সেইজন্যে কামপ্রবণতাও।

রুমী বলল—এইরকম লোকদের আমি একদম দেখতে পারি না।

আমি বললাম—সেই জন্যেই তো জয়সিং তোমার কাছে না গিয়ে শিশোদীয় রাজকন্যাকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন।

রুমী বলল—জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে অশালীন হবে কিনা ভাবছি।

বললাম—আমাদের তো অদৃশ্য চুক্তিপত্রে সই করাই আছে, শালীনতা বজায় রেখে আমরা সব কিছু করতে পারব।

রুমী যেন ভরসা পেল—আচ্ছা বলেই ফেলি, ঐ পাহাড় সদৃশ মাধো সিং-এর কোন সন্তান হয় নি?

বললাম - না।

রুমী হেসে বলল—জানতাম, হবে না।

আমাদের মনে হচ্ছিল যন্তর-মন্তরে একজন গাইড পেলে ভাল হয়। জিনিসগুলোকে একটু বোঝবার চেষ্টা করতাম। জ্যোতির্বিদ্যার এক কণাও

জানি না, গাইড বললেও বুঝতে পারব কিনা জানি না। তবু একজন বুঝিয়ে দেবার লোক পেলে যেন ভাল হয়। কিন্তু চারিদিকে রোদ খাঁ-খাঁ করছে। দর্শকও তেমন নেই। আমরা দুজন, আর অনেক দূরে দূরে দু' চারজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাইড বোধ হয় বুঝতে পেরেছে এখন থাকা বেকার, তাই কেটে পড়েছে। দু'তিন জায়গায় দেখলাম সিঁড়ির মত কেবল উঠে গেছে। একটা সিঁড়িকে তো প্রায় আটতলা সমান উঁচু মনে হল। এর ওপর থেকে নাকি জয়সিং সূর্যের উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন লক্ষ্য করতেন। কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বেশ বুঝতে পারা যায় যে এটি একটি বিরাট কিছু এবং যিনি এটি করতে পারেন তিনি সামান্য নন।

ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে রুমী বলল—যিনি এমন পাণ্ডিত্যের অধিকারী তিনি যে বিশেষ গুণী তাতে সন্দেহ নেই, কি বল?

—বিন্দুমাত্র না। জবাব দিলাম।

রুমী আবার বলল—এমন গুণী লোক অতি বাজে লোকের মত ছলা-কলার আশ্রয় নিয়েছিলেন মনে করলে যেন কিরকম লাগে।

বললাম—কোন্ ব্যাপারে বলছ?

রুমা বলল—ভাই বিজয়সিংকে বন্দী করার ব্যাপারে।

রুমীর কথায় চলে গেলাম কোন্ অতীতে। দেখতে পেলাম জয়সিং বসেছেন রাজসিংহাসনে। এমন সময়ে একজন বিশ্বস্ত পার্ষদ এসে জয়সিংকে চুপি চুপি কি যেন বলল। জয়সিং-এর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। একটু পরে সেই কাঠিন্য মুছে গিয়ে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। তারপর বললেন—ডাক সর্দারদের।

পার্ষদ জয়সিংকে কি খবর দিল যার জন্যে তাঁর এই ভাবান্তর?

সে চুপি চুপি খবর দিল—মহারাজ, আপনার ভাই বিজয়সিং আপনার সিংহাসন দখল করতে চায়, আর সেই জন্যেই আসছেন প্রচুর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে।

জয়সিং জিজ্ঞাসা করলেন—এত সৈন্য সে পেল কোথায়?

সে জানাল—দিল্লীর বাদশা তাঁকে সাহায্য করছেন।

কথা তবু যেন জয়সিং-এর বিশ্বাস হয় না। বললেন—কোথা থেকে এ খবর পেলে?

পার্ষদ তখন একটি চিঠি জোব্বার ভেতর থেকে বার করল। জয়সিংকে দেখিয়ে বলল—এটি একজন বিশ্বস্ত লোকের লেখা সতর্কবাণী।

লোকটি দিল্লীর দরবারে চাকরি করে। জয়সিং-এর হিতাকাঙ্খী। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেই রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে জয়সিং ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। বুদ্ধিমান জয়সিং-এর ব্যবহারে ঔরঙ্গজীবের দরবারে

অনেকেই তাঁর গুণমুগ্ধ হয়েছিল। এ লোকটিও তাদের মধ্যে একজন। বিজয়সিং-এর ষড়যন্ত্রের কথা সে জানতে পারে, কারণ বিজয়সিং তো দিল্লীর বাদশার মন্ত্রী কামরুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ করেই ফন্দী আঁটছেন।

বিজয়সিং জয়সিং-এর বৈমাত্রেয় ভাই। জয়সিং সিংহাসনে বসলে বিমাতা পুত্রের প্রাণনাশের ভয়ে বিজয়সিংকে নিয়ে অম্বর থেকে চলে যান নিজের বাপের বাড়ি কীচিবারায়। মামার বাড়ি বিজয় সিং মানুষ হতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে শিখতে লাগলেন বড় ভাই জয়সিং-এর সঙ্গে বিরোধ করা। বড় হয়ে তাই ঠিক করলেন জয়সিং-এর সিংহাসন দখল করতে হবে। কিন্তু তাঁর সামর্থ্য নেই সে সিংহাসন দখল করবার। তাই কামরুদ্দিনকে হাত করে, তাঁর কাছ থেকে কিছু সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাত্রা করলেন জয়সিং-এর সিংহাসন দখল করতে।

যাই হোক জয়সিং প্রস্তুত হলেন কৌশলে বিজয়সিংকে দমন করতে। জয়পুর থেকে ছ'মাইল দূরে বুসারে বিজয়সিং অপেক্ষা করবেন আর জয়সিং সেখানে যাবেন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

ইতিমধ্যে রাজ্যে রটিয়ে দেওয়া হল যে জয়সিং-এর সঙ্গে রাজমাতাও যাবেন বুসারে দুই ভাইয়ের মিলন দেখতে। সেইমত ব্যবস্থা হল।

জয়সিং চলেছেন বুসারে। অনেক দিন পরে ছোট ভাই বিজয়সিং-এর সঙ্গে দেখা হবে। সঙ্গে কোন সৈন্য-সামন্ত নেই, কেবল কয়েকজন বিশ্বস্ত সর্দার আছে।

আর সৈন্য নিয়েই বা তিনি যাবেন কেন? তিনি তো যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। বিজয়সিংহ যা চায় দিয়ে দেবেন। সঙ্গে চলল রাজমাতার পালকি আর তার সঙ্গে পরিচারিকাদের চারদিক ঘেরা সাড়ে তিন হাজার শিবিকা।

সংবাদ পেয়ে বিজয়সিং হাঁফ ছাড়লেন যে, জয়সিং-এর সঙ্গে সৈন্যসামন্ত আসছে না। জয়সিং নিশ্চয় ভয় পেয়েছেন।

যথা সময়ে জয়সিং এলেন। সঙ্গে সামান্য কয়েকজন সর্দার এসেছেন মাত্র। পালকিতে রাজমাতা এবং সাড়ে তিন হাজার পরিচারিকারা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

জয়সিং-এর সঙ্গে দেখা করে বিজয়সিং বুসার রাজ্য চাইলেন। চাইলেন বললে ভুল হয়, দাবি করলেন! জয়সিং বিনা বাক্যে বুসারের দানপত্র তাঁর হাতে তুলে দিলেন আর একথাও জানিয়ে দিলেন—যদি সে চায় তাহলে অম্বরের অর্ধেক দিতেও তিনি প্রস্তুত। বিজয়সিং দেখলেন এ তো মন্দ মজা নয়! জয়সিং নিতান্তই ভয় পেয়েছেন। কাজেই হৃষ্ট মনে এবারে অন্তঃপুরে চললেন রাজমাতার দর্শনে। সঙ্গে জয়সিং চলেছেন। পরীক্ষা করতে

জয়সিং কোমর থেকে তরোয়াল খুলে নিজের শিবিরে রেখে গেলেন। তাই দেখে বিজয়সিং কোন্ লজ্জায় অস্ত্র আর বহন করেন। তিনিও নিরস্ত্র হয়ে চললেন রাজমাতা দর্শনে। ব্যস্! জয়সিং-এর তাঁবুতে যেতেই কাজ শেষ। বিজয়সিং বন্দী হলেন। পালকিগুলিতে ছিলেন সেনাপতি, সর্দার আর সশস্ত্র সৈন্য।

এইভাবে সেদিন বিদ্রোহীকে জয়সিং দমন করেছিলেন।

রুমীর কথায় আবার ফিরে এলাম যন্তর-মন্তরের প্রান্তরে। রুমী বলল—কি, চুপ করে আছ কেন? ছোট ভাইকে ওরকম চালাকি করে বন্দী করা ঠিক হয়েছে?

বললাম—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। জয়সিং-এর মত জ্ঞানী লোক সেদিক থেকে কোন ভুল করেন নি। সরলভাবে চাইলে হয়তো ছোট ভাইকে আধখানা রাজ্য ছেড়ে দিতেন।

রুমী একমত হয়ে বলল—তা বটে।

আর দেরি করা ঠিক নয়। যন্তর-মন্তর থেকে বেরিয়ে একটা সাইকেল-রিকশা করে জহুরী বাজারের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এলাম। গাড়ি থেকেই হাওয়া মহল দেখিয়ে দিলাম রুমীকে। একেবারে রাস্তার ধারেই হাওয়া মহল। সওয়াই প্রতাপ সিং এটি রানীদের হাওয়া খাওয়ার জন্যে তৈরি করেছিলেন। হাওয়া মহলের গঠন-রীতি বিচিত্র! গোলাপী রঙের বিরাট মৌচাকের যেন আধখানা। ন'তলা—মৌচাকের আকারে একটি দেওয়াল। পুরুমাত্র ছ' ইঞ্চি। ইংরেজীতে এর নাম 'প্যালেস অব উইণ্ড' হলেও এটি একটি দেওয়াল ছাড়া কিছু নয়। গায়ে নানা আকারে বাতাসের অসংখ্য প্রবেশ পথ। দেখতে সত্যিই মনোরম। গরমের দিনে রানীরা এই দেওয়ালের অন্তরালে বসে হাওয়া খেতেন।

রুমী বলল—নামব না?

বললাম—হাওয়া মহলের বাইরেটাই দেখবার। ওপারে কিছু নেই।

রুমী বলল—এমন সুন্দর জিনিসটাকে পারিপার্শ্বিকতা অসুন্দর করে দিয়েছে।

সত্যি তাই। চার পাশে দোকানপাট, নোংরা চট ঝুলছে কোথাও। ফেরিওয়ালা, ভিখিরি ফুটপাথটাকে যা-তা করে রেখেছে। এই জন্যে ফটোতেই হাওয়া মহলকে দেখতে ভাল।

জহুরী বাজারের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে গাড়ি থেকে নামলাম। দেখলাম ভট্টাচার্য ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন।

বললাম—আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি। আশা করি আপনাকে বেশীক্ষণ কষ্ট করতে হয়নি।

ভট্টাচার্য অমায়িক হেসে মুখ ভরিয়ে তুলে বললেন—আরে না না! আমি এসে দাঁড়িয়েছি এইমাত্র।

ভট্টাচার্য সযত্নে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি। পুরোন আমলের বাড়ি। সমস্তটা শক্ত চূণা পাথরের। বিরাট বাড়ি, অসংখ্য ভাড়াটে। ভট্টাচার্যও তাঁদের একজন।

ভট্টাচার্য সরল মানুষ। বললেন—দীর্ঘ তিরিশ বছর এই বাড়িতে ভাড়া আছি। খুব কম ভাড়া মশাই, মাত্র কুড়ি টাকা। ঘর আছে একটা বড়, তিনটে ছোট। সামনে আছে এক ফালি ছাদ, সেটা অবশ্য কমন্।

তিন তলা সিঁড়ি ভেঙে ভট্টাচার্য কথিত কমন্ ছাদ পেরিয়ে এবার আসল জায়গায় এসে গেলাম। বড় ঘরটা দিয়েই প্রবেশ পথ। আর যে তিনখানা ছোট ছোট ঘরের কথা বলেছিলেন সেগুলো বড় ঘরটার দুপাশে। অর্থাৎ ভট্টাচার্য যেটিকে বড় ঘর বলেন আমাদের এ অঞ্চলে তাকে ঘেরা দালান বলে।

ঢুকেই দেখা পেলাম পূর্ণ ভট্টাচার্য-পরিবারের। তাঁরা আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। দালানটিকে ওঁরা করেছেন প্রধান ঘর। কারণ, মনে হল যাবতীয় জিনিসপত্র এ ঘরেই রাখা আছে। আর যে তিনটি ছোট ঘর সেগুলো হয়তো কেবল শোবার ঘর হিসেবেই ব্যবহার করা হয়।

ভট্টাচার্য প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। চলল কিছুক্ষণ নমস্কার প্রতি নমস্কারের পালা। তিন মেয়ের মধ্যে ওপরের দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছোট মেয়ের বিয়ে হয় নি। এইটির জন্যেই তাহলে পাত্রের কথা আমাদের বলেছেন। এবার ভট্টাচার্যের গিন্নীর দিকে ভাল করে চোখ পড়ল। —বেশ সুন্দরী। ভট্টাচার্যের কথানুযায়ী ভদ্রমহিলার অনেক বয়স হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ভট্টাচার্যর বয়স তো কম হয় নি। ভট্টাচার্যর কথা নেহাৎ মিথ্যা নয়—সুন্দরী মহিলার প্রেম নিবেদন তিনি ঠেলতে পারেন নি। প্রৌঢ় বয়সেও রূপ সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে এখনও। বয়সকালে তিনি যে রীতিমত রূপসী ছিলেন বলাই বাহুল্য! ভদ্রমহিলাও নিজের বিষয়ে বেশ সচেতন। প্রসাধন করে রয়েছেন ওই দুপুরেও। ভট্টাচার্যর পক্ষে ওনার গিন্নী "মুক্তোর মালা"। কথাবার্তাও বেশ সুন্দর! মেয়েরা কিন্তু কেউ মায়ের ধারা পায় নি। বাঙালী হলেও এনাদের চেহারা এবং কথাবার্তায় স্থানীয় প্রভাব পড়েছে অনেক। এটাই স্বাভাবিক। পুরোপুরি বাঙালী থাকতে গেলে বাংলাতেই থাকতে হবে। আমার ছোড়দাকেও দেখেছি। চিরটা কাল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর চেহারা এবং কথাবার্তায় বোঝা কঠিন যে তিনি একজন বিশুদ্ধ বাঙালী।

ভট্টাচার্য-গিন্নী ঘুরে ঘুরে আমাদের সব ঘরগুলো দেখালেন। যা

ভেবেছিলাম তাই—এত ছোট ছোট ঘরে বিছানা ছাড়া আর অন্য কোন জিনিস রাখা মুশকিল। আশ্চর্য! কোন ঘরের দরজা-জানালার কবাট নেই। সব পর্দা ঝুলছে, তাও ভারি পর্দা না। আলগা করে টাঙানো। হাওয়ায় খুব উড়ছে। শুনলাম মাঝে মাঝে জামাইরা এসে দু' চারদিন কাটিয়ে যায়। ছুটি-ছাটা পেলে ঝরিয়া থেকে ছেলে-বৌ এসেও থাকে। আড়াল-আব্রুর প্রশ্ন আছে, কিন্তু এ বাড়িতে মনে হল তার অভাব।

রুমী বলল—এখানের বাড়িতে কি দরজা-জানালার কবাট থাকে না? অনেক বাড়িই দেখলাম এরকম।

ভট্টাচার্য-ঘরণী বললেন—এ বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয় নেই। এত ঘর ভাড়াটে যে চোর আসতেই ভয় পাবে। আর আমরা তো তিন তলায় আছি, আরও নিরাপদ। পুরোন কালের বাড়ি, দরজা-জানলার কবাট ছিল না, আমরাও আর লাগাবার দরকার বোধ করি নি।

এরপর রুমীর সঙ্গে একটু রসিকতা করে বললেন—আর কি হবে? আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি ভাই।

সময়ে সময়ে রুমী কেমন যেন বেরসিক হয়ে ওঠে। ওকথার পর ওর অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া উচিত। তা সে না গিয়ে বলল—আপনারা না হয় বুড়ো হয়েছেন। আপনাদের মেয়ে-জামাই, ছেলে-বৌ?

ভট্টাচার্য-ঘরণী বললেন—ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন—এ সব অঞ্চলে এমন বাড়ি অনেক আছে।

আমরা বাংলার পরিবেশে হয়তো এমন ব্যবস্থা কল্পনা করি না। কারণ সে দেশে আব্রু রক্ষার ব্যবস্থা আলাদা। তাই রুমীর অস্বস্তি লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এক ঘর এক দোর। বিশ ঘর ভাড়াটের একটাই ব্যবহার্য উঠোন, তাদের দুটি মাত্র আধঢাকা স্নানঘর, এমন দৃষ্টান্তর অভাব কলকাতায় নেই কি? রুমী বরাবর কলকাতায় বাস করে কেন এমন বিস্মিত হল কে জানে! ওর মত মেয়েরা হয়তো সেই পরিবেশে থাকতে পারবে না। কিন্তু যারা আছে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। তাদের অভ্যাসে হয়ে গেছে সেই পরিবেশে আমোদ-আহ্লাদ করা। শখ-সাধ মেটান, সেই পরিবেশেই বছর বছর বংশ বৃদ্ধি করা, নাইবা থাকলে নিবিড় গোপন জায়গা! বহু লোক-বিশিষ্ট স্বল্প-পরিসর অনেক বাড়ির কথা জানি যেখানে অলিখিত একটা চুক্তি থাকে—প্রয়োজনে একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষে করে চলবে। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ'। এ তো জানা কথা। দেশের ভৌগোলিক গণ্ডি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটায় আব্রু ও শ্লীল-অশ্লীলের সংজ্ঞা। সমাজে লজ্জা আব্রুর নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা বা মাপকাঠি নেই। এক পরিবেশে যেটা

অশোভন বলে মনে করি অন্য পরিবেশে তাই হয়ে ওঠে সুন্দর। আমরা আমাদের সাধারণ সমাজে পেট বার করা খাটো জামায় শোভিতা যুবতী দেখলে 'ছি ছি' বলে চোখ আড়াল করি। কিন্তু আদিবাসীদের যুবতী মেয়ে যার যৌবন ও দেহ-সৌষ্ঠব এই বঙ্গ দুহিতার থেকে অনেক গুণ বেশী, তাকে স্বল্পবাস এবং বক্ষশ্রী আড়াল করা মাত্র একটি কাঁচুলি জড়ানো অবস্থায় দেখলে আমরা কি 'ছি ছি' করি? বাঙালীদের মামা-ভাগনীর সম্পর্ক মধুর, শৃঙ্গার-রসাত্মক নয়, সখ্য ও মাধুর্য রসঘন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তামিলী ও মালেয়ালীদের সমাজে ভাগনীর কাছে মামাই হল আদর্শতম বিয়ের পাত্র। মামা বিয়ে না করলে কন্যাকে অন্য পাত্রস্থ করা হয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ সভ্য সমাজে, সে বাঙালী বা অবাঙালী যাই হোক না, বৌদি দেওরের সম্বন্ধ সখ্য বা বাৎসল্যের। রামায়ণের যুগে এ সম্বন্ধ ছিল সম্পূর্ণ ই বাৎসল্যের। আমাদের সমাজে এখন দেখি কিছু সখ্যের, কিছু বাৎসল্যের, কোথাও হয়তো সখ্যই প্রাধান্য পায়। উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'এ আছে। শৃঙ্গার-রসাত্মক কোন ক্ষেত্রেই নয়। যেখানে বৌদি দেওরের সম্পর্ক আদি রসাত্মক হয়ে ওঠে সেটাকে আমরা বলি ব্যভিচার, অস্বাভাবিক। কিন্তু রাজস্থানীদের এমন অনেক সমাজ আছে যার নিয়ম বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর ছোট ভাই বৌদিকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করে ঘর সংসার করবে। মায়ের বয়সী বৌদি হলেও ক্ষতি নেই!

উদাহরণ আরও আছে। কোন কোন জায়গার যুবতীরা সদা সচেষ্ট যাতে বুকের সামান্য অংশও অন্য লোকে দেখতে না পায়; কিন্তু পাহাড়ী অঞ্চল, মরুভূমি অঞ্চল অথবা অনেক গ্রামাঞ্চলের ভরা যৌবনবতীরা সচ্ছন্দে সকলের সামনে শিশুকে স্তন দেয়।

ভট্টাচার্য-ঘরণী বেশ যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন। অনেক রকম রান্না করেছিলেন।

আমরা বললাম—আমাদের জন্যে এত রকম রান্না করে সময় এবং অর্থ দুটোর প্রতিই নির্মম হয়েছেন।

ভট্টাচার্য-ঘরণী সপ্রতিভভাবেই বললেন—সামান্য আয়োজনই করেছি। আপনারা লজ্জা করে কম খেয়ে আমার প্রতি নির্মম হবেন না যেন।

বললাম—এত রকম মাছ পেলেন কোথায়? রাজস্থানে ঢোকার পর থেকে মাছ খেতে পাই নি! যদিও দু' এক জায়গায় দেখেছি সরকারের মাছের চাষ, কিন্তু কোন হোটেলই মাছ খাওয়াতে পারে নি।

উত্তর দিলেন ভট্টাচার্য—নামেই এখানে মাছের চাষ হয়! তাও যা হয় বেশীর ভাগ চালান যায় বাইরে। সামান্য কিছু বাজারে আসে স্থানীয় লোকেদের জন্যে। সামান্য পরিমাণে বাজারে আসে বলে হোটেলওলারা

তা নেয় না। অবশ্য মাছ যা খাবার জয়পুরেই খেতে পাবেন, রাজস্থানের আর কোথাও বিশেষ মাছ পাবেন বলে মনে হয় না। উদয়পুর, আজমীর এসব জায়গায় দীঘিতে, হ্রদে অনেক মাছ দেখতে পাবেন। তাদের সুস্পষ্ট চিক্কণ বিশাল দেহ আপনাদের রসনার চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারে, কিন্তু তাদের খাবার উপায় নেই, সবই জৈন আশ্রিত।

খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যখন বার হলাম তখন ঘড়ির কাঁটা দুটোর ঘর পার হয়ে গেছে। ভট্টাচার্য আমাদের হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা চাইলাম না অত কড়া দুপুরে বুড়োমানুষকে কষ্ট দিতে, তাই তাঁকে নিরস্ত করে ওনার বাড়ির গলিমুখ থেকেই বিদায় দিলাম।

ভট্টাচার্য বললেন—আপনাদের এগিয়ে দিতে পারলে আমার অতিথি আপ্যায়ন সম্পূর্ণ হত। একটু যেন খুত থেকে গেল।

আমি বললাম—এমন কথা কেন বলছেন ?

ভট্টাচার্য বললেন—রামচন্দ্রের বনবাসকালে কোন মুনি সম্ভবতঃ শৌনক, ঠিক মনে পড়ছে না, এসে রামচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইলেন। রামচন্দ্র বললেন—প্রভু, আমি তো এখন বনবাসী, আপনাকে কি দিয়ে তুষ্ট করব ? আমার কিছুই যে নেই ! তুষ্ট করতে না পারলে আতিথেয়তা হবে না তো ! মুনি বললেন—দ্রব্যসম্ভারই একমাত্র অতিথি সৎকারের উপায় নয়। দ্রব্যসম্ভার ছাড়াই অতিথি সৎকার করা যায়। এই বলে মুনি একটি শ্লোক বলেছিলেন—

চক্ষুর্দদ্যাৎ মনোদদ্যাৎ বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতম্।
উত্থায় আসনং দদ্যাৎ প্রত্যুদ্‌গচ্ছেদ্ যথাবিধি॥

মানে, অতিথি এলে যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয তার জন্যে নজর রাখবে, তার দিকেই সব বিষয়ে মনোযোগ দেবে, সুমিষ্ট বাক্যে আলাপ করবে, যদি দ্বিতীয় আসন না থাকে তাহলে নিজে দণ্ডায়মান থেকে আসন গ্রহণ করতে দেবে এবং সে যখন যাবে সঙ্গে গিয়ে তাকে এগিয়ে দেবে।

ভট্টাচার্যের ভেতর সেই মুহূর্তে আমি দেখেছিলাম আর একজনকে। সেজন যেন সমাজের ওপর, বাপ-মার ওপর রাগ করে সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসা, সমাজের রীতি-নীতিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখা ব্যবসাদার ভট্টাচার্য নয়। এ ভট্টাচার্য রামায়ণ মহাভারতে পরম বিশ্বাসী, সমাজের অনুশাসনের কাছে নতমস্তক এক কোমল হৃদয় ব্রাহ্মণ-তনয়।

তবু তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম। ওই দুপুর রোদে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করল না।

হোটেল ফেরার পথে রুমী বলল—একটা কথা শোন।

বললাম—বল।

রুমী হাসি মুখে বলল—আমরা যেই ওনাদের ঘরে পৌঁছলাম অমনি ভট্টাচার্য-গিন্নী ছোট ঘরের একটায় গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখটাকে একটু ঘষে-মেজে এলেন। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

রাত্রে বিশ্রাম করতে করতে রুমী বলল—জয়পুরে আর কি কি দেখবার আছে?

—কি কি দেখেছ মনে আছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—আছে। রুমীর উত্তর।

বললাম—বলতে পারবে?

একধার থেকে রুমী বলে গেল আমের, শিলাময়ীর মন্দির, জলমহল, গৈতর, রামগড়, সিটি-প্যালেস, হাওয়া মহল, যন্তর-মন্তর, আর ভট্টাচার্যের বাড়ি।

ভট্টাচার্যের বাড়িকে রুমী একটা দ্রষ্টব্যের মধ্যে ফেলেছে দেখে না হেসে পারলাম না।

আমি বললাম—তোমার তালিকা থেকে একটা জায়গা বাদ গেছে। গৈতরের নাম করলে কিন্তু গল্‌তার কথা ভুলে গেছ।

—গল্‌তা কি ব্যাপার বল তো? ভুলে গেছি। রুমী প্রশ্ন করল।

—এখন যে জায়গাটির নাম গল্‌তা সেখানে এককালে গালব ঋষি মহাদেবের তপস্যা করতেন। ওই জায়গায় একটা উৎস থেকে জল বেরিয়ে কুণ্ডের সৃষ্টি করেছে। কোথা থেকে এই জল আসছে কেউ জানে না। প্রবাদ, গালব ঋষি তপস্যা শেষে নাকি পাহাড় গলে জলের আকারে পড়তে থাকে। 'গল্‌ৎ' শব্দের অর্থ গলে পড়ছে এমন। সম্ভবতঃ তার থেকেই 'গল্‌তা' নামের উৎপত্তি।

রুমী বলল—গালব ঋষির ব্যাপারটা বিশেষ জানি না, একটু বলবে?

বললাম—আমারও ঠিক মনে নেই। অনেক কাল আগে রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে পড়েছিলাম। যাই হোক, যতটা মনে আছে বলছি। লঙ্কা বিজয়ের পর রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করতে তিনি অযোধ্যায় এসেছিলেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় মান্ধাতা ও রাবণের মধ্যে সখ্যতা হয়। এই ঋষির গালব নাম কেন হল হরিবংশে তার মজাদার উল্লেখ আছে। সাংকৃতি, গালব, মুদ্গল প্রভৃতি ঋষিরা বিশ্বামিত্রের ছেলে। বিশ্বামিত্রের স্ত্রী মধ্যম পুত্রকে গলায় বেঁধে রেখে অন্য ছেলেদের ভরণ-পোষণের জন্যে একশ' গরুর বিনিময়ে বিক্রি করেন। এই জন্যে ঐ ছেলের নাম গালব হয়ে গেল।

পরদিন সকালে গেলাম মিউজিয়ামে। মিউজিয়াম বলে না দিলে মনে হবে এটি আর একটি রাজপ্রাসাদ। প্রবেশ করতে হবে প্রথমে যে হলে

তার নাম 'এ্যালবার্ট হল'। এখানে প্রায় ছাদ ঘেঁষে চোদ্দজন রাজার বিরাট বিরাট তেল রঙের প্রতিকৃতি টাঙান আছে। প্রথম ছবিটি মহারাজা পৃথ্বীরাজের—১৫০৩ সাল। আর শেষ ছবিটি দ্বিতীয় মাধো সিং-এর। তিনি মারা যান ১৯২২ সালে। গায়ত্রীদেবীর স্বামী রাজা মানসিং কিছুদিন আগে লণ্ডনে মারা গেছেন। দণ্ডায়মান মিউজিয়ামের একজন রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে-রাজার ছবি কোথায় রাখা হবে? রক্ষী একটি খালি জায়গা দেখিয়ে দিল। তারপরের রাজাদের আর জায়গা নেই।

মিউজিয়াম দেখতে যতখানি সময়ের দরকার আমরা ততখানি সময় দিই না। মিউজিয়ামের সংরক্ষিত দ্রব্যগুলোকে পরিচিতি ছাড়া দেখা আর 'কিউরিও'র দোকানে শোকেসে সাজান দ্রব্যগুলো দেখা একই ব্যাপার। বিজ্ঞানের বেগ মানুষের আবেগকে কেড়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে বিবিধ বস্তু সংগ্রহ ও রক্ষা করার পথ খুঁজে পাওয়া গেছে, কিন্তু সেই বিপুল সংগ্রহটিকে খুঁটিয়ে দেখবার আবেগ সাধারণ মানুষের কোথায়! অত সময় তো তাদের নেই। সুদীর্ঘ জীবন-সংগ্রামের ভেতর থেকে মাঝে মাঝে দর্জির দোকানে চুরি করে কেটে নেওয়া একফালি কাপড়ের মত কিছু সময় যে বার করে নেয় হাঁফ ছাড়বার জন্যে, সেই সময়টুকুকে সে চায় পরিপূর্ণ ভোগ করতে। সেই সময়ে কি ভাল লাগে ওই ক্ষুদে শীলমোহর-গুলো খ্রীষ্টপূর্ব কত শতকে কোন্ রাজা ব্যবহার করতেন, না সেই সময়ে ভাল লাগে জানতে ফসিলে পরিণত কঙ্কালটি কত হাজার বছর আগে সুমেরু অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিল! সাধারণ মানুষ চায় কম সময়ে, ভুল বললাম, সীমিত সময়ে যতখানি পারা যায় দেখে নাও। কি দেখলাম তার কুলজি জেনে কি হবে? এইভাবেই লোকে দেশ ঘোরে, দ্রষ্টব্য দেখে নেয়। তাই লোকে বলতে পারে পনের দিনে দক্ষিণ ভারতের সব দেখে এলাম। অথবা এবার পূজোর পাঁচদিন ছুটির সঙ্গে আরও পাঁচদিন ছুটি নিয়ে রাজস্থান দেখে আসব। এগুলো তারা বলতে পারে অনায়াসে।

আমাদেরও মিউজিয়াম দেখা এই ভাবেই হল। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবার চেষ্টা করি নি। জয়পুরের মিউজিয়াম বড় নয়। একদিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আর একদিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হবে। তার মধ্যে কয়েকটা নাতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ। যা দেখবার সেখানে দেখে নাও। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখি নি, কারণ তাহলে আমাদের হাতে যে কয়েক ঘণ্টা সময় ধরা আছে তাতে টান পড়বে। খুঁটিয়ে দেখতে গেলে মিউজিয়ামে যত কম জিনিসই থাকুক না কয়েক ঘণ্টায় শেষ করা যাবে না। অবশ্য সাল-তামামী বাদ দিলে সব মিউজিয়ামেরই বেশীর ভাগ জিনিস কমন পড়ে যায়। যেমন, বিভিন্ন সময়ের ভাস্কর্যের নমুনা, শীলমোহর, মুদ্রা, নানা

রকম পাথর, গয়না, চীন ও পারস্যের বর্ণালী পাত্র, বিভিন্ন শতকের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। জয়পুর মিউজিয়ামের দুটি জিনিস আমার সব থেকে ভাল লাগল। একটি—রাজস্থানী সমাজের বিভিন্ন মানুষের মানুষপ্রমাণ নিখুঁত মাটির মডেল। সত্যিকারের জামাকাপড় পরা, যে যার শ্রেণীর জীবিকায় রত। এমনকি রাজস্থানীদের সাধারণ বিয়ের আচার অনুষ্ঠানও পর পর বিধৃত করা হয়েছে ঐ মডেল দিয়ে। এদের দেখে রাজস্থানীদের শ্রেণীভেদ এবং তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। বিজলী বাতির আলোয় বিরাট বিরাট শোকেসে তাদের দেখাচ্ছে জীবন্ত। মনে হচ্ছে হয়তো সাময়িক থেমে গেছে, আবার নড়বে। রাজপুত পুরুষরা সাধারণতঃ যা পরে তা হল ধুতি, হাতওলা আঁটসাঁট বোতামহীন জামা—একে বলে বাঁদিয়া আঙ্গরাখা, আর মাথায় জড়ান থাকে পট্টিয়া। উৎসবের সময়ে ওরা পরে চুড়িদার পায়জামা, গায়ে কুর্তা ও তার ওপর আচকান। মাথায় পট্টিয়ার বদলে বিশ গজি থানের পাগা বা পাগড়ি। এই পাগাই ওদের বিলাসিতা। পাগা দেখে বোঝা যায় কে কতখানি শৌখীন! মেয়েরা পরে ঘাগরা যেগুলোতে ৩৬ থেকে ৪০ গজ পর্যন্ত কাপড় লাগে। উর্ধ্বাঙ্গে পরে কাঁচুলী আর ২½ থেকে ৩ গজ কাপড়ের উড়নি। সেই সঙ্গে পরে মোটা মোটা ভারী ভারী গয়না। সেই সব গয়নার কাজ দেখবার মত। বিবাহিতারা এই সঙ্গে একটা বাড়তি জিনিস পরে, গজদন্তের অনেকগুলো বালা। কোনটা সাদাই থাকে, কোনটা লাল রং করা। দ্বিতীয় ভাল লাগার বস্তুটি হল একটি 'রবাব'।

রুমীকে বললাম—এই তারের যন্ত্রটিকে ভাল করে দেখে রাখ, এর নাম রবাব। তোমার এককালে বেহালা বাজাবার ঝোঁক ছিল। এটির আকারের দিক থেকে না হলেও ধর্মের দিক থেকে বেহালার সঙ্গে কিছু মিল আছে। তানসেন নাকি এটি বাজিয়ে সম্রাট আকবরকে গান শুনিয়েছিলেন।

রুমী বলল—এ যে বিশাল কলেবর! তানসেন কি করে বাজাতেন?

বললাম—একটা ছবিতে দেখেছিলাম, রবাব যন্ত্রটি এক জায়গায় বসান আছে, আর গায়ক তার সামনে বসে বাজিয়ে গান করছে।

রুমীর বিস্ময় তখনও কাটে নি, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল সেই বিরাট কালো রঙের যন্ত্রটার দিকে। এক সময়ে বলল—তানসেন আকবরকে গান শুনিয়েছিলেন এটি বাজিয়ে, তার মানে প্রায় চারশো বছর আগেকার ঘটনা। রবাব এত পুরোনো যন্ত্র?

বললাম—চারশো বছর কি? রবাবের জন্ম তার অনেক আগে। হাজার বছর আগে বসুধা গ্রামের আবদুল্লা নামে একজন লোক এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্তা। *তখন এর নাম ছিল 'রুবেব'। উইলার্ড সাহেব স্পেনিস গীটারের সঙ্গে এর* সমতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

রুমী বলল—তুলির জগৎটা তোমার। কিন্তু সংগীতের জগৎটা আমার। রবাবের এত খবর তুমি জানলে কোথায় ?

বললাম—একবার যন্ত্রকোষের পাতা ওল্টাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানেই এ খবর পেয়েছি। আরও অনেক কিছু লেখা ছিল, ভুলে গেছি।

রুমীকে বললাম—রবাবের সুর শুনতে পাচ্ছ ?

জবাবে রুমী বলল—তুমি পাচ্ছ বুঝি ?

বললাম—পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আকবর বসে আছেন বহু রত্নখচিত স্বর্ণাসনে। তাঁর সামনে ঝকমকে পারস্যের পুরু গালচে পাতা। ধূপ-গুগ্‌গুলের গন্ধে সারা কামরা আমোদিত। ঘরের কোণে কোণে বসরাই গোলাপের ঝাড়। মাথার ওপর একদিকে পান্নার আর একদিকে পদ্মরাগ মণি সাজান নীলার ঝাড় লণ্ঠন। সোনা আর কুচি কুচি মুক্তা বসানো মখমলের পর্দাকে সরিয়ে সরিয়ে মৃদুমন্দ বাতাস এসে বাতি ঝাড়ের ঝোলানো ঝুরিগুলোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে জলতরঙ্গের টুংটাং আওয়াজ তুলছে। সম্রাট বসে আছেন। সামনে রবাব নিয়ে বসেছেন তানসেন। সম্রাটের ফরমাসের অপেক্ষা—কি রাগ তিনি শুনবেন। রাত্রি দুই প্রহর। মল্লার রাগের এই তো সময়। আকবর বললেন—মল্লার গাও। তানসেন মল্লার রাগে গান ধরলেন। গাইতে গাইতে তানসেন হয়ে গেলেন বিভোর। এত বিভোর হয়ে গেলেন প্রথানুযায়ী মল্লার রাগকে পরিবেশন করতে করতে সৃষ্টি করে ফেললেন মল্লারের আর এক রূপ। সৃষ্টি হল মিঁয়া তানসেনের মল্লার—মিঁয়াকি মল্লার।

রুমী বলল—এটি আবার কোন্ কোষে পেলে ?

বললাম—স্বরযন্ত্র কোষে।

রুমী বিস্মিত হয়ে বলল—স্বরযন্ত্র কোষ, তার মানে ?

বললাম—একজন বলেছিল আমাকে।

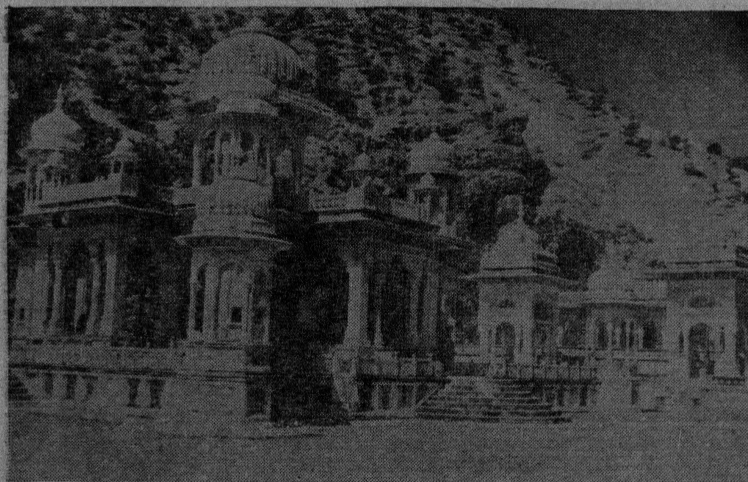
মিউজিয়াম দেখা শেষ! বাকী ছিল রামনিবাস গার্ডেন আর চিড়িয়াখানা। বিকেলের দিকে এ দুটো সেরে নিলাম। চিড়িয়াখানা ছোট। রামনিবাস গার্ডেন প্রকাণ্ড ভ্রমণোদ্যান। এককালের প্রমোদোদ্যান এখন ভ্রমণোদ্যান।

টা টা জয়পুর। ভোর ছ'টা থেকে আজমীর যাবার বাস ছাড়তে আরম্ভ করে। রাজস্থান গভর্নমেণ্টের রোডওয়ে সার্ভিস। সেই সঙ্গে প্রাইভেট মোটর যাবার জন্যেও তৈরি থাকে! মাথাপিছু ভাড়া একটু বেশী।

হোটেলের বেয়ারা ওম সিং আমাদের গাড়ি ঠিক করে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলে দিয়ে গেল। সে হোটেলের রাত-দিনের বেয়ারা। মাঝে সে কেবল কয়েক ঘণ্টা ছুটি নেয়, সেই ক'ঘণ্টার মাইনে পাবে না। হোটেলের সঙ্গে চুক্তি



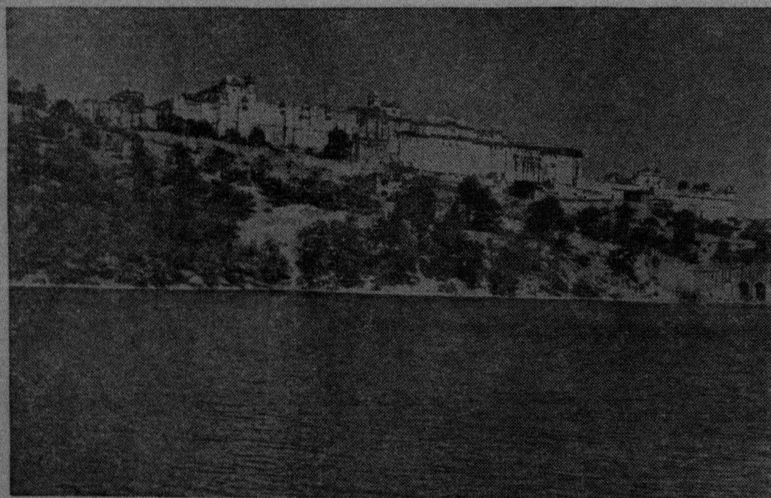
বিখ্যাত জয়পুর মিউজিয়াম।



রাজপুত রাজাদের সমাধিক্ষেত্র। স্থানীয় নাম 'গেতর'।

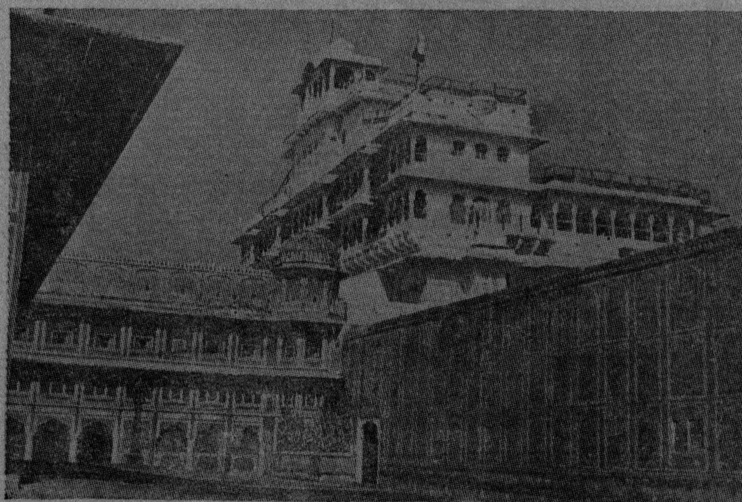


রাজপুত রাজাদের সমাধি-মন্দিরের শ্বেতপাথরে ভাস্কর্য।

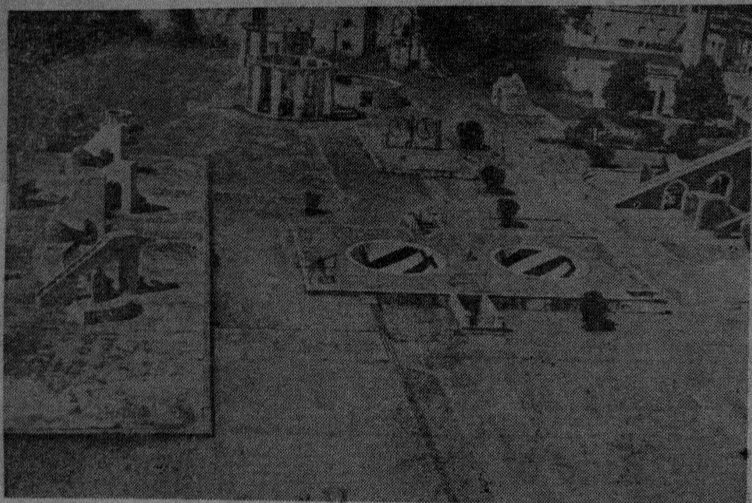


অম্বরের কেল্লা।

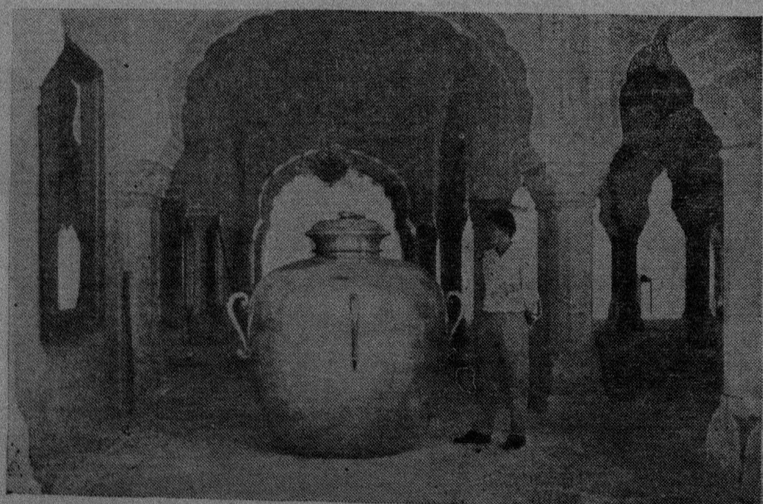
শিলিসের হ্রদ—আলোয়ার।



রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরের রাজপ্রাসাদ।



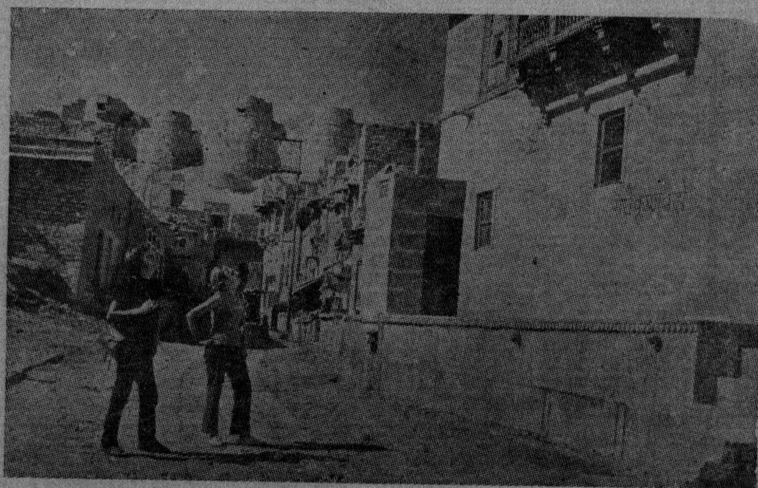
সোয়াই জয়সিংয়ের তৈরী জয়পুরের মানমন্দির।



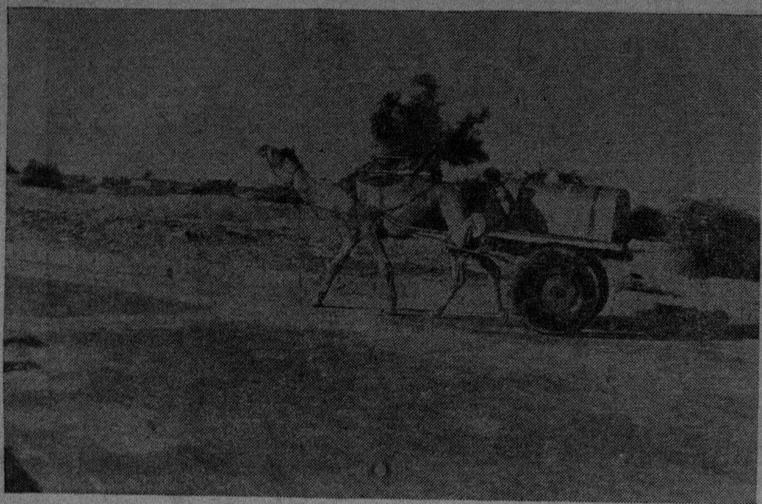
এই রূপোর জালাটির ওজন এগারো মণ। জয়পুর রাজপ্রাসাদে এই রকম দুটি জালা আছে। মহারানীদের প্রয়োজনীয় গঙ্গাজল রাখার জন্য ব্যবহার করা হত।



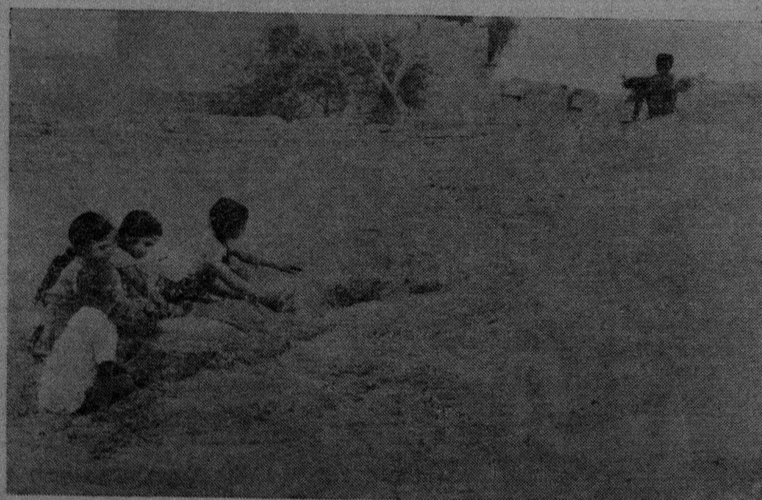
যোধপুরের আগের রাজধানী মান্দোরের বিখ্যাত উদ্যানে
স্তম্ভের আকারে তিনতলা মহল।



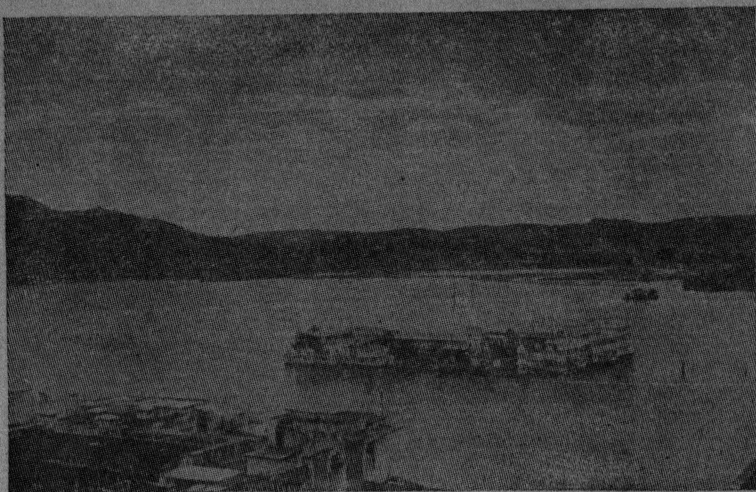
জয়শলমীর দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ দেখে বিদেশীরা মুগ্ধ।



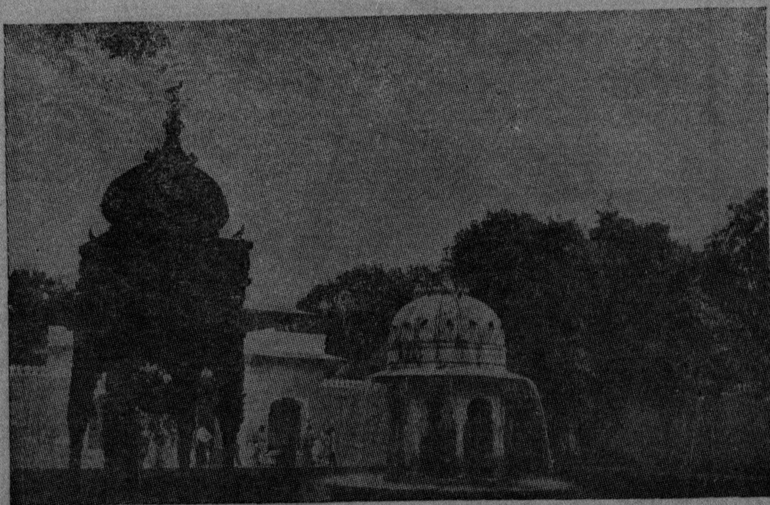
রাজস্থানের মরুভূমিতে এরাই যান, এরাই বাহন।—বিকানীর।



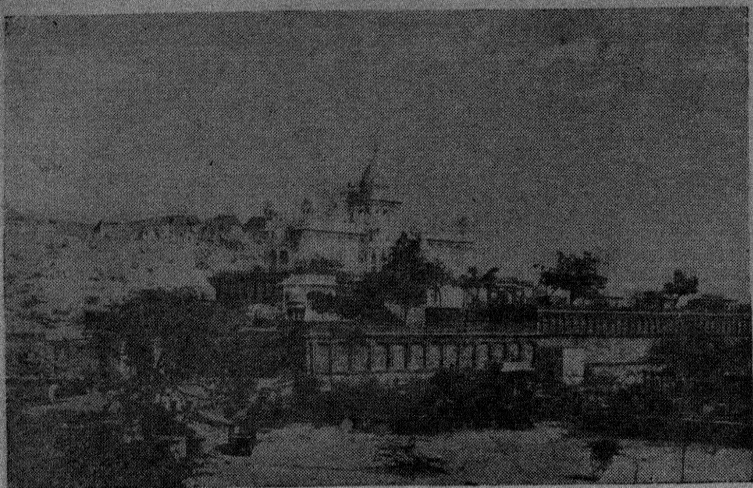
মরুভূমির শিশুর কাছে বালিই খেলার উপকরণ। জয়শলমীর-মরুভূমিতে শিশুদের খেলতে দেখা যাচ্ছে।



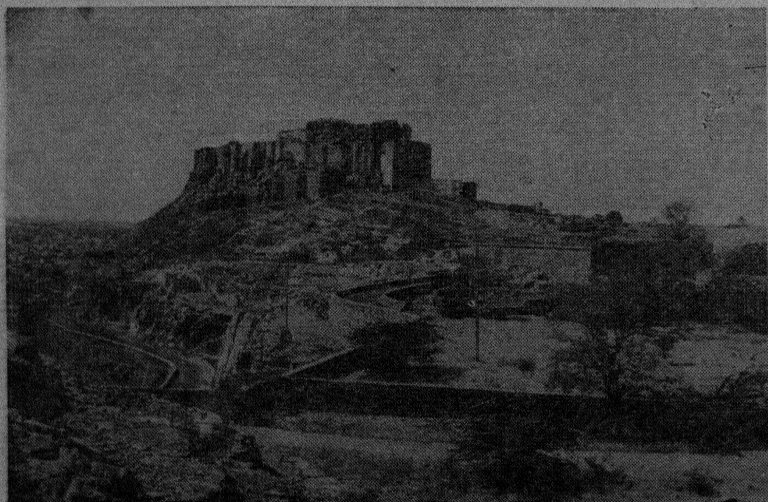
উদয়পুরে পিচোলা হ্রদের মধ্যে উদয়পুর রাজার প্রমোদ-প্রাসাদ
'জগনিবাস'। এখন বিলাসবহুল হোটেল।



সহেলিয়োঁ-কা-বাড়ি। উদয়পুর।



যশোবন্ত সিং নির্মিত 'যশোবন্ত থারা'।



যোধপুর কেল্লা।

করেছে! সে ক' ঘণ্টা সে করে ট্যুরিস্ট গাইডের কাজ। ছেলেটা ভাল। এই ক'দিনে আমাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। তারও বোধ হয় আমাদেরকে ভাল লেগেছিল। বলতে আরম্ভ করেছিল, হোটেলের বয়গিরি তার ভাল লাগে না। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে। ট্যুরিস্ট গাইডের কাজ খুব ভাল লাগে। কত রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা যায়। তারাও গাইডদের খুব ভাল চোখে ছাখে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে যারা টুরিস্টদের সঙ্গে আসে, গাইডদের ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়ে। ওদের কল্পনায় গাইড 'হিরো'। গাইডের চাকরিতে সম্মান আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে গাইডের কাজ করতে পার?

ওম সিং জবাব দিয়েছিল—কেন পারব না? একই জায়গায় একই কথা রোজ বলতে বলতে মুখস্থ হয়ে যায়।

আমি বলেছিলাম—কিন্তু কারও যদি নতুন কোন প্রশ্ন থাকে যা তুমি বল না!

সলজ্জভাবে সে বলেছিল—তখন একটু অসুবিধে হয়। আমরা বেসরকারী গাইডরা বেশীদূর জানতে পারা যায় এমন ভাবে নিজেদের তৈরি করি না। কারও কারও জ্ঞান হয়তো একটু বেশী হয়। তবে কাজ চালাবার মত শিখে রাখি। বেশী জানলে পরীক্ষা দিয়ে পাস করলে তবে গভর্নমেণ্টের গাইড সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তার মধ্যেও আবার এ-ক্লাস, বি-ক্লাস ভাগ থাকে, আমার গুরু বলেছে।

—কে তোমার গুরু? জিজ্ঞাসা করলাম।

ওম সিং বলেছিল—এখানকার গভর্নমেণ্ট ট্যুরিস্ট গাইড বিকাশ ভট্টাচার্য।

আমার কিন্তু কৌতূহল তখনও মেটে নি, তাই আবার বলেছিলাম—নতুন প্রশ্নের কি জবাব দাও?

সে বলেছিল—উত্তর জানা না থাকলে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলি, সঠিক উত্তরটা একটু পরে বলছি। দরকার মনে করলে তাঁরা অবশ্য টড্ সাহেবের বইয়েও দেখে নিতে পারেন। এগুলো নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই বলি।

ওম সিং-এর সোজা সোজা স্বীকারোক্তি শুনে অবাক্ হয়েছিলাম। আমার কাছে এইভাবে আত্মসমর্পণের কোন কারণ ছিল না। ও না বললে ওর এ ব্যাপার জানতেই পারতাম না। যার গাইড সার্ভিস জীবিকার একটা অঙ্গ তার এ স্বীকারোক্তি কখনই না করবার কথা। মাস্টারমশাইরা সচরাচর স্বীকার করেন কি যে অমুক জিনিস জানি না? ছাত্ররা মাস্টার-মশাইদের জিজ্ঞাসা করবে এবং মাস্টারমশাইরা তার উত্তর দেবে, পরস্পরের এই সম্পর্ক। অতএব ছাত্রদের কাছে জানি না বলা সব মাস্টাররা কি

পারেন? তাই কৌশলে এড়িয়ে যেতে হয় অনেক সময়ে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে।

যাই হোক কৌতূহল মেটাবার জন্যে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি যে টড্ সাহেবের বইয়ের কথা ট্যুরিস্টদের বল, তুমি কি বইটা পড়েছ?

ওম সিং সরলভাবেই বলেছিল—না, গুরুর কাছে বইটার কথা অনেকবার শুনেছি। অত মোটা বই পড়বার মত বিদ্যে আমার কোথায়?

তারপর দুঃখ করে আবার বলেছিল—আমার ওপর নির্ভর করছে বুড়ো মা আর বৌ-ছেলেমেয়ে। নইলে কবে হোটেলে বয়ের কাজ ছেড়ে দিতাম। বড় ইজ্জত নিয়ে নেয় হোটেল মালিকরা।

এ হেন সাদাসিধে ওম সিংকে ভাল লাগবারই কথা।

ওম সিং খাঁটি রাজস্থানী। এর গাইড গুরু বিকাশ ভট্টাচার্য। অম্বর প্রাসাদ দেখবার সময়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ২৪ পরগনার নৈহাটীতে বাড়ি। হৃদয়হরণবাবুর মত ইনিও ভাগ্যান্বেষী হয়ে এসেছিলেন এখানে। বাঙালীর ঘরকুণো বলে যে বদনাম আছে এই ভট্টাচার্যরা তা কি এখনও ভঙ্গ করেন নি? ঐ বদনাম দিয়েছে একদল লোক যাদের নিজের দেশে অন্ন নেই, তাই তারা অন্য দেশে দৌড়ায়। কিন্তু যাদের ঘরেই অন্ন তারা বাইরে কেন যাবে? প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই বাইরে যাবে। বংশপরম্পরায় সে প্রয়োজন বাঙালীর হয় নি। ফলে তারা অন্যদের মতে ঘরকুণো! ভোরবেলায় জিনিসপত্র নিয়ে গোছগাছ করে আমাদের আজমীরের মোটরে তুলে দিয়ে বলল—বাসে একটু কষ্ট হত বাবুজী, তাই এ্যাম্‌বাসডারে তুলে দিলাম। আরাম করে যাবেন এবং বাসের ঘণ্টাখানেক আগেই পৌঁছে যাবেন।

তারপর মনে করিয়ে দিল, ফটোটা যেন কলকাতায় গিয়েই পাঠিয়ে দিই।

ওম সিং-এর ফটো। গতকাল সে বলেছিল যে, আমাদের নাকি তার বেজায় ভাল লেগেছে। কাজেই কিছু নিশানা চাই। কি নিশানা অর্থাৎ নিদর্শন তাকে দিই? অগত্যা তাকে বলেছিলাম—তোমার একটা ফটো তুলে নিচ্ছি। কোলকাতায় গিয়ে প্রিণ্ট করে পাঠিয়ে দেব। ওম সিং খুব খুশী হয়েছিল। ছবি তোলার আগে শার্টের কলারটায় দু'বার হাত ঘষে ইস্ত্রি করে নিল, তারপর চুলটা একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে আমাদের রুমের কোণে রাখা টেলিফোনের রিসিভার কানের কাছে তুলে পোজ দিয়ে দাঁড়াল। ছবি তুললাম। সে একগাল হেসে বলল—এ ছবি মানিব্যাগের সঙ্গে পকেটে রেখে দেবে। গাইড্ সার্ভিসে কাজে লাগবে।

গাড়ি জয়পুর ছাড়ল। আজমীরে যাবার প্রথম মোটরটাই আমরা ধরেছিলাম। প্রভাত-সূর্যের রশ্মির একটা সঞ্জীবনী ক্ষমতা আছে। প্রভাতের

হাওয়া দূর করে ক্লান্তি, আর প্রভাত-রশ্মি দেয় আনন্দ। জয়পুর থেকে আজমীর যাবার পথ সোজা। মোটরের সামনে উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি সোজা পিচ্‌ঢালা পথটা মিঠে রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রাস্তার দু'ধারে গাছরাও যেন নতুন প্রভাতের স্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে সোনা-স্নিগ্ধ রোদ মাখামাখি করে নিচ্ছে। জয়পুর থেকে আজমীর পঁচাশি মাইল দূরে। ঘণ্টা তিন সাড়ে-তিনেকের জন্যে নিশ্চিন্ত। দেহমনকে অস্বাভাবিক হালকা ক্লেদমুক্ত মনে হল। দু'পাশে যা দেখছি, তাই ভাল লাগছে। একদিন সম্রাট আকবর হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে এই পথে দিল্লী থেকে আজমীর গিয়েছিলেন। সে দিন এমন সুন্দর পথ ছিল কিনা জানি না, তবে পথ একটা ছিল ঠিকই, না হলে নতুন পথ করে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল মোগল সৈন্যরা। উদ্দেশ্য খুব মহৎ ছিল না। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা বন্ধুত্ব স্থাপন করলেও রাজস্থানকে আত্মসাতের স্বপ্ন দেখা তিনি ছাড়েন নি। তাই তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে আজমীরকে মোগল সৈন্যের প্রধান ঘাঁটি বানালেন। দিল্লী বড় দূর। অত দূর থেকে কি দুরন্ত রাজপুত রাজাদের বশে আনা যায়? সুতরাং রাজপুতানার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করলেন হাজার হাজার সৈন্যের ক্যাণ্টনমেণ্ট এবং ১৫৭০ সালে তৈরি করলেন সেই ক্যাণ্টনমেণ্টে একটি দুর্গ। এখান থেকে ইচ্ছেমত রাজপুতানার যে কোন জায়গায় ফৌজ পাঠান যাবে।

আজমীর যেতে বার দুয়েক মোটর দাঁড়াল। শেষ যেখানে দাঁড়াল তার নাম কিষাণগড়। সামনেই চায়ের দোকান। সারি সারি মোড়া সাজানো। গাড়িতে যাত্রী ছিলাম পাঁচজন। ড্রাইভার নেমে একটা মোড়া টেনে বসে গেল চা আর পকোড়া খেতে। অন্য যাত্রীরাও নেমে অনুরূপ আচরণ করতে লেগে গেল দেখে রুমীকে বললাম—এস, আমরাও মহাজনদের পথ অনুসরণ করি।

মোড়ায় বসে আমরাও একটু চা-পকোড়া খেয়ে নিলাম।

আবার মোটর চলতে শুরু করল। একসময়ে আজমীর শহরকে দূর থেকে দেখে মোটামুটি বড় শহর মনে হল। যত কাছে আসতে লাগলাম, শহর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দেখলাম শহরকে বাড়ানো হচ্ছে বৃহত্তর। এককালে হয়তো খুব বড় শহর ছিল, হয়তোই বা বলছি কেন! সত্যিই তো এককালে বড় শহর ছিল। আজমীর এক আশ্চর্য শহর! রাজস্থানের সব জায়গাই হিন্দু-প্রধান, কিন্তু আজমীর রাজস্থানের কেন্দ্রের শহর হয়েও মুসলমান-প্রধান। চতুর্দিকে হিন্দুরাজ্য নিয়ে আজমীর মধ্যিখানে যেন এক মুসলমান রাজ্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। কি করে সম্ভব হল?

এমনটি সম্ভব করেছেন সম্রাট আকবর। আকবর বুঝেছিলেন রাজপুতানাকে শাসনে রাখতে হলে দরকার কেন্দ্রস্থলে একটি ঘাঁটি গড়ে তোলা। তাই করলেন; ১৫৭০ সালে তৈরী হল এখানে একটি মোগল দুর্গ, সম্ভবতঃ রাজস্থানের মাটিতে প্রথম মুসলিম দুর্গ। জাহাঙ্গীর এখানেই পাকাপোক্তভাবে বসবাস করতেন। টমাস্ রো এখানেই জাহাঙ্গীরের দর্শন পেয়েছিলেন। শাজাহান বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এখানেই লুকিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দারা ও সুজার জন্ম আজমীরে হয়। এই রকম নানারকম সব ঘটনার সাক্ষী আজমীর। এসব ঘটনার অনেক আগে থেকেই এখানে মুসলমান আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১১৪৩ সালে মৈনুদ্দিন চিস্তি আফগানিস্তান থেকে এখানে এসে বাস করতে থাকেন। মৈনুদ্দিন চিস্তি ছিলেন একজন সিদ্ধ পীর; নব্বুই বছর বয়সে এখানে দেহরক্ষা করলে তাঁর ওপর গড়ে উঠল দরগা। আজমীরের বিখ্যাত খাজা দরগা সাহেব তাঁরই সমাধি-আয়তন। সেই থেকে আজমীর হয়ে উঠল মুসলমানদের তীর্থস্থান। তীর্থ করতে সেই কাল থেকে এখনও পর্যন্ত দলে দলে মুসলমান ভারতের নানা দেশ থেকে এখানে আসে। শুনেছি বাইরে থেকেও অনেকে আসে তীর্থ করতে। সমগ্র এশিয়ায় নাকি এতবড় তীর্থস্থান আর নেই। দরগা সাহেবের জন্যে আজমীরকে বলে—আজমীর শরিফ বা পবিত্র আজমীর। মক্কার পরে আজমীর তীর্থ।

আমাদের মোটর আজমীরের কাছে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটে ছোট ছোট ছেলে মোটরের দরজায় এসে দাঁড়াল। আমাদের মোটরের তিনজন সঙ্গীর হাবভাব দেখেই বোঝা গেল তারা নিত্য যাতায়াত করে। ওদের বিরক্ত করল না। আমাদেরও মালপত্র সামান্য, কিন্তু ছেলেগুলো এসে ঘিরে দাঁড়াল। নতুন মানুষদের এরা চেনে। সঙ্গে স্ত্রীজাতি থাকলে তো কথাই নেই। কাছেই দাঁড়িয়েছিল একটা টাঙা। একটা ছেলেকে বললাম মালপত্র টাঙায় তুলে দিতে। মাল তোলা হলে ছেলেটার হাতে একটা সিকি দিলাম। ও মা! সে সন্তুষ্ট হল না। জিনিসপত্র নিয়ে ছেলেটাকে এক পাও হাঁটতে হয় নি, মোটরের পাশে এসে টাঙা দাঁড়িয়েছিল, ছেলেটা কেবল মোটরের লাগেজবুট থেকে বিছানা আর সুটকেশটা বার করে টাঙায় তুলে দিয়েছিল। রাজস্থানের অন্যান্য জায়গার কুলিদের দাবির অনুপাতেই ছেলেটাকে সিকিটা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজমীরের কুলির পয়সার চাহিদা বেশী। একটা মজার ঘটনা ঘটল—ছেলেটাকে যখন এক সিকির বেশি মোটেই দিলাম না সে তখন গাড়োয়ানের পাশে উঠে আমাদের সঙ্গে চলতে লাগল! প্রথমে ভাবলাম ছেলেটা বোধ হয় টাঙাওলার কেউ হবে। কিন্তু টাঙাওলাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম সে ওর কেউ না। আর

কিছু না দিলে ও পিছু ছাড়বে না। দরকার হলে যেখানে উঠব ও দরজার সামনে বসে থাকবে যতক্ষণ না তার পছন্দমত পাওনা মেটে। এ তো ভারি মজার ব্যাপার! দার্জিলিঙের কথা মনে পড়ল! তখনও নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন হয় নি, শিলিগুড়ি দিয়ে দার্জিলিং যেতে হত। ল্যাণ্ডরোভারে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাচ্ছি। ড্রাইভারের পাশে একটি আসন দখল করে বসেছি। আমার পাশের আসনটি দখল করেছে একটি নেপালী মেয়ে। সাজ-পোশাকে বা কথাবার্তায় নেপালী বোঝা যায় না। বাঙালীদের মত পরিপাটি করে শাড়ি পরেছে এবং কথা বলছে সুন্দর ইংরিজীতে। অল্পক্ষণ পরেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। পথের পরিচয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করল আগে কখনও দার্জিলিংএ এসেছি কিনা। বললাম, না। তখন সে আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, কুলিরা মালপত্র বইতে যা খুশী দর বলবে, বিশ-ত্রিশ গজ যাবার জন্যে এক টাকাও চাইতে পারে, কিন্তু তাতে দর কষাকষি করবার কোন দরকার নেই। যা চাইবে তাতেই যেন রাজী হয়ে যাই, নয়তো কুলি বাক্স বিছানা বইবে না। তারপর গন্তব্য স্থানে গিয়ে ন্যায্যমত পাওনা মিটিয়ে দিলেই চলবে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে পাহাড় পথ বলে কুলির ভাড়া সমতল থেকে কিছু বেশী হবে। সেই বিবেচনা করে কুলির পাওনা মিটিয়ে দিলেই কুলি চলে যাবে। প্রথমটা নিতে রাজী হবে না হয়তো, অনেক সময়ে চলে যাবে না হয়তো, কান্না-কাটির ভাব দেখাবে, তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, কিছুক্ষণ বাদে গোলমাল না করে চলে যাবে। নতুন জায়গায় ক্ষণিকের আলাপ এই মেয়েটির পরামর্শ কাজে লেগেছিল। এখন জানি না দার্জিলিংয়ের কুলিগুলো সেইরকম আছে কিনা। তবে মেয়েটির পরামর্শ আমার সেই সময়ে কাজে লেগেছিল।

আজমীরে আমাদের টাঙায় চেপে ছেলেটার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া দেখে সেই কথাই মনে পড়ছিল—এদের প্রকৃতি তো আমার জানা নেই। যাই হোক, রেস্ট-হাউসে আমাদের মালপত্র তুলে দিয়ে ওর প্রাপ্যটা নিয়ে চলে গেল।

প্রাচীনকালের অজয়মেরু এখনকার আজমীর। সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চৌহান রাজারা অজয়মেরুতে রাজত্ব করেন। আজমীর শহরের পেছনেই তারাগড় পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকাতে শহরটাকে ছবি মনে হয়।

আজমীর বেড়াতে আমাদের বেশী দিন লাগবে না বই পড়ে এবং গাইডম্যাপ দেখে বুঝেছিলাম। রুমীকে বললাম—স্নান খাওয়া সেরে চল আজ শহরটা দেখে নিই। কাল সকালে যাব পুষ্কর-তীর্থ।

টাঙাওলাকে বলা ছিল, দুটো না বাজতেই এসে গেল। আমাদের নিয়ে চলল দরগা সাহেবে। টাঙাওলা বলল—বাবুজী, আজমীর শরিফ এত মেহমানের পায়ের ধুলো পায় দরগা সাহেবের জন্যে। এখানে লোকে এসেই দরগা সাহেবে যায়। এ বহুত বড় শরিফ জায়গা। তাই আগে আপনাদের খাজা সাহেবের দরগায় নিয়ে যাচ্ছি।

ভাল কথা, কিন্তু মনে ভাবলাম লোকটা এক তরফা বলল কেন? লোকে এখানে আসে কি কেবল দরগা সাহেব দেখবার জন্যে? পুষ্কর-তীর্থ কি কিছু নয়, না? পুষ্কর তীর্থ যাবার পথ আজমীর দিয়েই তো!

আমি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম আমাদের পেছন পেছন একটা লোক সাইকেল চালিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে সাইকেলটা এত কাছে চলে আসছে যে সাইকেলের চাকাটা টাঙার পেছনের পাদানিতে লেগে যাচ্ছে। লোকটার নজরও দেখি আমাদের দিকে। আমার ভাল লাগছিল না। না লাগারই কথা। একটা লোক সমানে আমাদের দেখতে দেখতে পেছন পেছন আসবে, একি ভাল লাগবার কথা? রুমীও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। বলল—লোকটা তো বিশ্রী! কি চায়?

—কি চায় আমিই কি ছাই জানি? ভাবছি লোকটাকে এবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব, ব্যাপার কি? এমন সময়ে টাঙাওলা বলল—বাবুজী, দরগা সাহেব এসে গেছে।

টাঙা থামল। নামলাম আমরা। একি! লোকটাও নামল সাইকেল থেকে! লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছে। ভাবনায় পড়লাম, দরগা সাহেব দেখা প্রায় মাথায় উঠল, লোকটাকে নজরে রাখা দরকার। শুনেছিলাম রাজস্থানের অন্যান্য জায়গার মত আজমীর অত নিশ্চিন্ততার জায়গা নয়। দেখা যাক। এত সাত-সতেরো যখন ভাবছি লোকটা হঠাৎ যেন সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দিল। সাইকেল থেকে নেমে পকেট থেকে একটা টুপি বার করে পরে নিল। আমাদের দরগায় ঢোকবার আগেই বলল—বাবুজী, আপনারা মাথা কিছু দিয়ে ঢেকে নিন। খোলা মাথায় দরগা সাহেবে ঢুকতে নেই।

এই বলে লোকটা প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল—আপনারা ভারতের সব থেকে প্রাচীন দরগা দেখছেন। এটি শুধু মুসলমানদের তীর্থক্ষেত্র নয়, হিন্দুদেরও। এই যে বিরাট দরোয়াজা দেখছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম এটি বানিয়ে দিয়েছেন।

এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম—লোকটা দরগা সাহেব দেখাবার গাইড।

গাইডের কথামত আমি মাথা রুমাল দিয়ে ঢাকলাম আর রুমী আঁচল দিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে নিল—মাথায় কাপড় দিলে আমাকে কেমন দেখায়?

বললাম চমৎকার !

গাইড বলতে লাগল—দরগা সাহেব সিদ্ধ জায়গা। এখানে যে যা মানসিক মানে তা পূরণ হয়। হিন্দু মুসলমান সবাই আসে এখানে। মানত মানে।

তারপর বললে—আসুন, ঘুরে দেখুন।

দরগা সাহেবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশার অবদান আছে। প্রধান প্রবেশ তোরণ করে দিয়েছেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, মূল সমাধি মন্দির করে দিয়েছেন আকবর, শ্বেত পাথরের ভারি সুন্দর স্থাপত্য। আর জুম্মা মসজিদটি করে দিয়েছেন সম্রাট শাজাহান। হিন্দুদের সমাধি-মন্দিরের সঙ্গে মুসলমানদের কবর-মন্দিরের তফাৎ জাঁকজমকে। মুসলমান নবাব-বাদশার জাত। তাই তারা কবরখানাকে মহা আড়ম্বরে সমৃদ্ধ করে তুলতে থাকে। কালে সেটি হয়ে ওঠে একটি বিরাট দ্রষ্টব্যের স্থান। সাধু-সন্তদের কবরখানা তীর্থস্থান হয় মুসলমানদের কাছে। অন্যদের কাছে পবিত্রস্থান হলেও আড়ম্বর তাক লাগিয়ে দেয়। হিন্দুরা দার্শনিক, সমাধিক্ষেত্রকে যদি কখনও তীর্থস্থান করে তো সর্বদা লক্ষ্য রাখে তার গাম্ভীর্যর দিকে, তার শান্তির দিকে। যারা আসবে সেখানে তারা যেন বিভ্রান্ত হয়ে, হকচকিয়ে গিয়ে সমাধিক্ষেত্রকে চঞ্চল না করে। আপনা থেকেই যেন তাদের শমদমভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে।

দরগা সাহেবকে দেখে পাশাপাশি এই কথাই আমার মনে পড়ছিল। একটি কবরস্থান কত সমৃদ্ধ হতে পারে দরগা সাহেব না দেখলে আন্দাজ করা যাবে না।

দরগা সাহেব থেকে বেরোবার মুখে গাইড দেখাল দু'পাশে দুটি বিরাট লোহার হাঁড়ি। হাঁড়ি না বলে 'হাণ্ডা' বলাই ভাল, বিরাট হাঁড়ি বোঝাতে আমরা হাণ্ডা কথাটাই তো ব্যবহার করি। উত্তর প্রদেশে এরকম শব্দের চল আছে। ছোট ঘুঁটেকে 'গোহরি' আর বড় ঘুঁটেকে 'গোহরা', ছোট ঘুঁড়িকে 'ঘুড্ডি' আর বড় ঘুঁড়িকে 'ঘুড্ডা' যখন বলা হয় তখন বড় হাঁড়ি বোঝাতে 'হাণ্ডি'র বদলে 'হাণ্ডা' কথাটা ব্যবহার না করার কোন কারণ নেই। পাল-পার্বণের সময়ে একটি হাণ্ডাতে ষাট মণ অপরটিতে নব্বই মণ খিচুড়ি রান্না হয়। সেই রান্না করাও নাকি দেখবার জিনিস। কাঙালীদের মধ্যে ঐ খিচুড়ি বিলানো হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন ভেদ নেই। সবাই পাবে দরগা সাহেবের খিচুড়ি। দরগা সাহেবের তহবিলে তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই মুক্তহস্তে দান করে।

দরগা সাহেব দেখার পর টাঙাওলা নিয়ে এল তারাগড় পাহাড়ের নীচে। বললে—ওপরে দেবীর মন্দির আছে।

রুমীকে বললাম—ওপরে উঠবে নাকি ?

রুমী বলল—না, অনেক উঁচু !

জানতাম রুমী পাহাড়ে উঠবে না। ও সব পারে, কিন্তু পাহাড়ে ওঠাতে ওর ভীতি আছে। রাঁচির হুনড্রু প্রপাত দেখতে নিয়ে গিয়ে বেজায় মুস্কিলে পড়েছিলাম। আমার নিজের চালাকির ফল নিজেকেই ভোগ করতে হয়েছিল। হুনড্রু প্রপাত দেখতে গেলে বাস যেখানে দাঁড়ায় সেই সমতল থেকে বেশ খানিকটা নীচে নেমে যেতে হবে, তবে প্রপাতকে দেখা যাবে। রুমী যখন বলল, ওপরে উঠতে হবে না তো? বললাম, না, নীচে নামতে হবে। ও রাজী হয়ে গেল। নীচে না নামলে জলপ্রপাত দেখা যাবে না। ঠিক কথা, কিন্তু দেখার পর যতখানি নামব ততখানি ওঠবার যে প্রশ্ন থাকবে একথা তখন রুমীর খেয়াল হয় নি। আমিও খেয়াল করিয়ে দিই নি, কেবল চালাকি করে নামিয়েছিলাম। যাই হোক, এর ফল দাঁড়াচ্ছিল সাংঘাতিক। শেষরক্ষা বুঝি হয় না! ওপরে সে উঠে আসতে পারে না! শেষ কালে বলে কি, আমার হাত ধরে তুমি দাঁড়িয়ে থাক, আমি বোধ হয় আর বাঁচব না। সেই থেকে কানমলা খেয়েছি, ওঠা নামার ব্যাপারে ওর ইচ্ছেই প্রাধান্য পাবে।

রুমী বলল—তারা পাহাড়ে উঠব না। এটা কি ব্যাপার একটু বলে দাও, তাহলেই হবে।

বললাম—এই পাহাড়ের ওপর রাজা অজয়রাজ দ্বাদশ শতাব্দীতে একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন। অতি দুর্ভেদ্য দুর্গ। ৮০০ ফুট ওপরে আশি একর জায়গা জুড়ে ছিল এই দুর্গ। দেড হাজারের মত লোক এখানে থাকতে পারত। বিশ ফুট উঁচু, বিশ ফুট চওড়া আর প্রায় দু' মাইল লম্বা এক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত এই দুর্গ। এ হল সাতশো খ্রীষ্টাব্দের কথা। অজয়রাজ নিজে ছিলেন একজন সুদক্ষ রণকুশলী, কাজেই নিজের দুর্গটি নিখুঁত করে তৈরি করেছিলেন। গজনীর সুলতান মামুদ সোমনাথ ও থানেশ্বর প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে লুট করেছিলেন, কিন্তু অজয়রাজের এই তারাগড় জয় করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। অজয়রাজ তাঁর নগরের নাম দিয়েছিলেন অজয়মেরু; আজমীর নাম এসেছে তার থেকেই।

তারাগড়ের পাদদেশে আছে, আড়াই দিনকা ঝোপড়া। রুমীর চোখে এর বিশেষত্ব ঠিক ধরা পড়েছে। বললে—এটির স্থাপত্য রীতি কি রকম অদ্ভুত!

বললাম—কি রকম?

সে বলল—হিন্দু আর মুসলমানী ঢং মেশানো।

বিস্মিত হয়ে বললাম—ঠিক ধরেছ। কিন্তু পারলে কি করে?

দাম বাড়াবার জন্যে রুমী আমার প্রশ্নটাকে যেন গ্রাহ্যই করল না। আমি আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছি দেখে বলেই ফেলল—অবাক লাগছে, না? বাবার কাছে শুনেছিলাম।

একটু থেমে বলল—আরও শুনবে? দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চৌহান-রাজা চতুর্থ বিগ্রহরাজ সংস্কৃত শিক্ষা-আয়তন হিসাবে এটি করেছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে মোহম্মদ ঘোরী আজমীর জয় করে নিয়ে বললেন—আড়াই দিন সময় দিলাম, তার মধ্যে এটিকে মস্‌জিদ বানিয়ে দাও। আমি উপাসনা করব। ব্যস্, তাই হল। আড়াই দিনে সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ মসজিদে পরিণত হল। সেই থেকে এর নাম হল 'আড়াই দিন কা ঝোপড়া'। ১২১১ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস ক্ষমতায় আসার পর আড়াই দিন কা ঝোপড়ার সংস্কার করেন, পরে ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুৎমিস প্রবেশদ্বারের চারদিকে বড় বড় আরবী অক্ষর খোদাই করে দেন। চেয়ে দেখ, অক্ষরগুলো দরজার দু'ধারে এবং মাথায় কেমন সুন্দর মোটিফ্ তৈরি করেছে।

রুমীর কথায় মুগ্ধ হলাম। বললাম—চমৎকার! তুমি বলে না দিলে ইলতুৎমিসের এই সংস্কারটা হয়তো ধরতে পারতাম না।

আড়াই দিনের ঝোপড়াকে বেশীক্ষণ দেখবার কিছু নেই। আমাদের টাঙা অপেক্ষা করছে। ফিরে যাব, হঠাৎ চোখে পড়ল একজনকে। অবাক হবার কথা। এখানেও তিনি?—কিন্তু এখানেও তিনি এসেছেন সত্যি! রুমী আমার বিস্ময় লক্ষ্য করেছে, বলল—কি ব্যাপার বল তো?

বললাম—চেয়ে দেখ ঐ যে ভদ্রলোক, এক গাল দাড়ি-গোঁফ আর ঝাঁকড়া চুল।

রুমী দেখতে পেল ভদ্রলোককে। এখানেও আবার সেই ভদ্রলোক! ওনাকে মাঝে-মাঝেই আমরা দেখতে পাই নানা জায়গায়, যেখানে দেখব বলে মোটেই ভাবি নি। প্রথম দেখি ওনাকে বছর পাঁচেক আগে আগ্রায়। তাজমহলের সামনে। সন্ধ্যে হয় হয়, সূর্য সবেমাত্র অস্ত গেছে, তাজমহলের রম্য অবয়ব থেকে সরিয়ে নিয়েছে আলো। যে সামান্য আলোর রেশ তখন তার গায়ে আছে তাতে কারুকার্যকে স্পষ্ট দেখা যায় না। তাজমহলের সমগ্র রূপটাই চোখে পড়ছে। আরও যেন বিশাল আর বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। লোকের কাছে শুনেছি এই রকম সন্ধ্যের সন্ধিক্ষণে তাজমহলকে নাকি স্বপ্নময় মনে হয়। আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল বিষণ্ণ। 'তাজমহলের সামনে রুমীকে সেই কথা বলছিলাম। পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, ঠিক বলেছেন। বিষণ্ণই মনে হয়।

আমরা চমকে উঠেছিলাম। দু' জনের কথার মধ্যে বিশেষ করে দুজন স্ত্রী-পুরুষের নিজস্ব কথার মধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের এমন অনধিকার প্রবেশ রীতিমত ভদ্রতা-বিরোধী। ভদ্রলোক নিজের ভুল হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই মাপ চেয়ে বলেছিলেন—আমারও মনে

হচ্ছিল এই সন্ধ্যের প্রাক্‌কালে আনন্দে গরবিণী তাজমহল কত বিষণ্ণ, এমন সময়ে শুনতে পেলাম আর একজনেরও বিষণ্ণ লাগছে। আমার সুরের সঙ্গে তার সুরও এক পর্দায় মিলে গেল বলেই নিজের অজ্ঞাতসারে সেই কথা বলে ফেললাম। শোনেন নি কখনও দুটি বাদ্যযন্ত্র একই সুরে বাঁধা থাকলে একটিকে বাজালে অপরটি যন্ত্রী ছাড়াই মাঝে মাঝে সুর যোগায়?

বলেছিলাম—না, আপনার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই!

সেদিন এইভাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়। ওনার সঙ্গে তারপর অনেক কথাবার্তা হয়েছে। কথা শুনে বুঝেছিলাম উনি পণ্ডিত লোক। বিদায় নেবার সময়ে বলেছিলেন—পত্নী-বিয়োগের শোক ভুলতে শাজাহানের পত্নী-বিয়োগের শোক দেখতে এসেছিলাম। কিন্তু নিরাশ হলাম! মমতাজকে অমরত্ব দিতে গিয়ে শাজাহান নিজে অমর হয়ে গেল। নিজে প্রকট হয়ে উঠল। তাজমহল দেখলেই প্রথমে মনে আসবে কে করেছে? সম্রাট শাজাহান। তারপর প্রশ্ন আসবে কার স্মৃতি? পত্নী মমতাজের!

ভদ্রলোক চলে গেলে দুঃখ হয়েছিল। স্ত্রীকে ভদ্রলোক খুবই ভাল-বাসতেন। ভদ্রলোককে তারপর দেখেছি অনেক জায়গায়। দেখেছি পূর্ব-ভারতের সীমানায় নেফার লোহিত নদীর ধারে চুপচাপ বসে থাকতে। দেখেছি মধ্যভারতে রামটেক পাহাড়ে বসে থাকতে। বলেছিলেন—আহা! ভাবতে ভারি ভাল লাগে বনবাসকালে একদিন রামচন্দ্র সীতাকে পাশে নিয়ে এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। আর আজকে দেখলাম সেই ভদ্রলোককে পশ্চিম ভারতের আজমীরে।

রুমী বলল—প্রতিবারে ভদ্রলোক যেন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন।

বললাম—তুমি কি বুঝিবে বালা, ওর দগ্ধ মরমের জ্বালা!

ভদ্রলোক বোধ হয় আড়াই দিনকা ঝোপড়ার উর্দু অক্ষরের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। আমরা চুপিচুপি গিয়ে ওনার পাশে দাঁড়ালাম। আমাদের চিনতে ওনার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। আমাদের দেখে একগাল হেসে বললেন—আবার বিপরীত গ্রহের সমাবেশ হল।

নমস্কার জানিয়ে বললাম—মানে?

ভদ্রলোক বললেন—এ-বি-সির মত সোজা। একজন সব পেয়ে সমৃদ্ধ হয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর অন্যজন সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে।

ওনার জন্যে দুঃখ হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম—কবে এখানে এলেন?

ভদ্রলোক বললেন—রাজস্থানে ঢুকেছি মাসখানেক হল। আজমীরে এসেছি কাল সকালে। আজ চলে যাব।

বললাম—এক দিনেই দেখা হয়ে গেল সব?

ভদ্রলোক বললেন—খুঁটিয়ে দেখা হবে না, মোটামুটি দেখে যাব। কিছু বাদ রেখে যাওয়া ভাল, আবার আসতে ইচ্ছে করবে।

—এখান থেকে কোথায় যাবেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

ভদ্রলোক বললেন—জয়পুর হয়ে বিকানীর। আপনারা কোন্ দিক থেকে আসছেন?

বললাম—ঠিক উলটো দিক থেকে, মানে বিকানীর জয়পুর হয়ে আসছি।

ভদ্রলোকের নামটা অনেকক্ষণ থেকে মনে করবার চেষ্টা করছিলাম। নামটা মনে পড়ল না, পদবিটাই মনে পড়ল—মিত্র। মিত্র বললেন—বিকানীর শুনেছি মরুভূমির শহর। অবশ্য মরুশহর সম্বন্ধে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে! জয়শল্‌মের দেখে নিয়েছি। বিকানীর কি ঐরকম সাংঘাতিক?

বললাম—সাংঘাতিক মানে?

একটু হেসে মিত্র বললেন—যান। গেলেই বুঝবেন।

একটু থেমে মিত্র বললেন—সাংঘাতিক কেন যখন জিজ্ঞাসা করেছেন তখন এটুকু অন্ততঃ ধরা যায় যে বিকানীর জায়গাটা আপনার কাছে কষ্টকর মনে হয় নি। জয়শল্‌মেরে কিন্তু একটু কষ্ট হবে।

বললাম—বিকানীর শহর মরুভূমিতে হলেও কোন অসুবিধে হয় নি। রাজা বিকা রাওয়ের তৈরী পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি সুন্দর শহর। সমস্ত শহরটা সাড়ে চার মাইল লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, শহরে ঢোকবার পাঁচটা দেউড়ি পাবেন। জয়পুরকে বলা হয় গোলাপী শহর, বিকানীরকে দেখবেন লাল ও হলুদ রঙের। রাজস্থানী রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক খুব। মোগল নবাবদের অনুকরণে জাঁকজমক। বিকানীরের জাঁকজমক পৌঁছেছে যেন তুরীয় পর্যায়ে। সেই সময়কার রাজার অনেক জিনিসই হয়তো এখন নেই, কিন্তু যতটা দেখতে পাবেন তা বড় কম নয়। বিহ্বল হয়ে যাবেন বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে দুর্গটা। বিকা রাওয়ের দুর্গ হল আদি। তার ১০০ বছর পরে অর্থাৎ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রায় সিং একই জায়গায় নতুন দুর্গ করেছিলেন। বিকানীরবাসীরা দুর্গটিকে খুব পবিত্র মনে করে। বিকানীরে অনেক মন্দিরও দেখতে পাবেন। থর মরুভূমিতে একদিকে বিকানীর আর এক দিকে জয়শলমীর। বিকানীর শহরের কাছে গ্রাম উদয়রামসর মাত্র সাত মাইল। স্বাস্থ্যনিবাসের জন্যে গ্রামটি বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন মরুভূমি আস্তে আস্তে গ্রামটিকে গ্রাস করে ফেলছে। যে স্বাস্থ্যনিবাসটি ছিল সেটি এখন অনেকখানিই বালির তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে। থর মরুভূমির আকার নেহাৎ কম নয়। লম্বায় ৩৭০ মাইল এবং চওড়ায় প্রায় ২২০ মাইল। থরের রুক্ষতার কবলে রাজস্থান ছাড়াও পড়েছে

আরও তিনটি প্রদেশ। তারা হল পাঞ্জাব, হরিয়ানা আর গুজরাট। থরের চেহারাও কিন্তু বদলে যাচ্ছে। বিকানীরের এক বৃদ্ধর কাছে শুনলাম বছর-পঞ্চাশ আগে থরে একটা মাঝারি আকারের পাহাড় ছিল। বেড়মেরের কাছে ছিল এই পাহাড়। অনেকেই দেখেছে এই পাহাড়কে দূর থেকে, বিশেষ করে পোকারাণ, জয়শলমীরের লোকরা। কারণ বেড়মের তো জয়শলমীরের কাছেই। কিন্তু সে পাহাড় এখন সবটাই বালির নীচে। ঐ জায়গায় গেলে এখন দেখা যায় বিরাট এক বালির স্তূপ। বালিয়াড়ির সংখ্যাও গেছে অনেক বেড়ে। থর মরুভূমি যে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে সন্দেহ নেই। তবুও এখন পৃথিবীর সব থেকে জনবহুল মরুভূমি এটি। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬২ জন লোক বাস করে। মানুষের সঙ্গে এখানে বাস করে প্রচুর ইঁদুর। মরুভূমির বিরাট শত্রু ইঁদুর। মাইলের পর মাইল খুঁড়ে খুঁড়ে মাটি আলগা করে দেয়। আলগা মাটি ধুলোর সৃষ্টি করে। কিছুদিন আগে একটা কাগজে দেখেছিলাম বছরে শুধু ইঁদুরই মাটি খোঁড়ে প্রতি হেকটেয়ারে ১৭০০০ কিলোগ্রামের মত। এর ফলে মরুভূমির আকাশ সর্বদাই ধুলোয় ধুলোয় ছেয়ে থাকে। খালি চোখে সকল সময়ে বোঝা না গেলেও থাকে। আর আকাশে ধুলো ছড়িয়ে থাকার মানেই আশপাশ থেকে আগত বাতাসের জলকণা শুষে নেওয়া। একে মরু অঞ্চলে গাছপালার অভাব, তার ওপর বাতাসের জলকণা এইভাবে শুষে নেওয়ায় বৃষ্টি হয় না বা খুব কম হয়।

একে গাছপালা কম তার ওপর এসব অঞ্চলের লোকরা বেজায় গরিব বলে গরু মহিষ থেকে ছাগল পালে বেশী। কারণ ছাগল পুষতে খরচ কম। তা ছাড়া ছাগল প্রায় সব রকম গাছপাতাই খায়। ছাগল যখন খায় মুড়িয়ে খায়। গাছপালা কমে গিয়ে মরুভূমি ছড়িয়ে পড়ার আর একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায়। থর যাতে আর না বাড়ে তার জন্যে সরকার খাল কেটে জল বহাবার এবং বন-রোপণের কাজে হাত দিয়েছেন। এ পরিকল্পনার রূপায়ণ অনেক জায়গায়ই চোখে পড়ল।

মিত্র আমার কথা আগ্রহ নিয়ে শুনলেন, বললেন—বিকানীরের আর কি বিশেষত্ব?

বললাম—মরুভূমিতে যুদ্ধ চালাতে গেলে উটই বাহন হিসেবে প্রধান সম্বল। উট-বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র বিকানীর।

মিত্র বললেন—আপনার খবরগুলো খেয়াল রেখে বিকানীর দেখার চেষ্টা করব, ভালই হল।

আমরা কথা বলতে বলতে আড়াই দিনকা ঝোপড়ার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। কথাপ্রসঙ্গে রুমী বলল—আমরা কি দেখেই যাব, রাজস্থানকে একটু ভাবব না? সবই দেখছি দেখবার। ভাববার জায়গা নেই?

আমার হয়ে মিত্রই উত্তরটা দিলেন—ভাববার জায়গা পাবেন, চিতোর-গড়। সেখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। এক খাবলা জায়গা আর একটি ছোট পাহাড়। যা কিছু দু' ঘণ্টায়ই দেখা হয়ে যাবে, কিন্তু ভাবনার শেষ হবে না। সেই চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভাবনা শুরু হয়েছে আর আজ বিংশ শতাব্দীতেও লোকে ভেবে যাচ্ছে।

এমন একটি ভঙ্গীতে মিত্র বললেন কথা ক'টি যে, ভারি ভাল লাগল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে রুমীও তাকিয়ে রইল।

আড়াই দিন কা ঝোপড়া দেখে ফেরার পথে মিত্র বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বিকেলবেলা আমরা আনা সাগরের ধারে গিয়ে বসলাম। সাগর নাম সার্থক। হ্রদ সাগরে পরিণত হয়েছে। প্রবল ঢেউ। বিকেলের শন্‌শনে হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে। চারদিকে গোধূলি-লগ্ন রঙের সেলোফেন কাগজে নিসর্গকে মুড়ে দিয়েছে। নীল-কমলা নিসর্গ চিত্রে আনা সাগরের জলকে লাগছে আরও নীল। ধু-ধু জলরাশির ওপারে বিশাল পাহাড়—নাগ পাহাড়। ওর কোল দিয়েই কাল আমরা যাব পুষ্কর তীর্থ দেখতে। এপারে সম্রাট শাজাহানের বাঁধিয়ে দেওয়া শ্বেত পাথরের সুদীর্ঘ মনোরম চত্বর। চত্বরের মাঝে মাঝে শ্বেত পাথরের ছত্রি। প্রত্যেক ছত্রির নীচ দিয়ে নেমে গেছে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে যাওয়া যায় আনা সাগরের জলে। পাহাড় আর আনা সাগরের জল নীল রং ছড়াচ্ছে, তার মধ্যে এই সাদা পাথরের চত্বরের যেন তুলনা নেই। শ্বেত পাথরের জন্যেই আনা সাগরের শোভা বেড়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ শাজাহান যেখানেই কিছু মহান অবদানের কথা ভেবেছেন সেখানেই তিনি শ্বেত-পাথরের আমদানি করেছেন। একটি বিষয়ে শাজাহানের গণনা অভ্রান্ত ছিল, তা হল কোন্ জায়গায় ঠিক শ্বেতপাথরের স্থাপনা করলে স্থানটির এবং শ্বেতপাথর উভয়েরই সৌন্দর্য বাড়বে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট বোধ।

আনা সাগরে কোন গাইড নেই। সাগরের ধারে বাগানে মালি আছে। জিজ্ঞাসা করতে মালি বললে, আনা সাগরের ধারে প্রথম বাগান করেছিলেন পৃথ্বীরাজের পিতামহ অর্ণবরাজ, আজমীরের লোকেরা বলে আনাজী, ১১৫০ সালে। কথিত আছে আনাজী পূর্বে এই জায়গায় এত শত্রু নিধন করেছিলেন যে এখানকার মাটি লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। সেই শোণিত-কলঙ্ক ধুয়ে ফেলার জন্যে নদীতে বাঁধ দিয়ে সেখানে এক বিরাট জলাশয় সৃষ্টি করলেন। এই ভাবে আনা সাগরের জন্ম হল। জাহাঙ্গীরের এই হ্রদের ধার এত ভাল লেগেছিল যে এর পাড়ে একটা সুন্দর বাগান করে দিলেন, নাম দৌলতবাগ। এর পরে আসল শাজাহানের যুগ। বাগানের মধ্যে সাগরের পাড়ে বানিয়ে দিলেন ১২৪০ ফুট লম্বা মার্বেল পাথরের

চবুতর বা চত্বর। এখন যে মনোরম উদ্যান দর্শকরা দেখতে পায় সেটি ১৯০৩ সালে ভারত সরকার যখন আনা সাগরের সংস্কার করেন সেই সময়ে জাহাঙ্গীরের দৌলতবাগকে সংস্কার করে করা হয়েছে।

রুমী বলল—যে খুশী বাগান করুকগে, আমরা আনাজীর করা বাগানেই বসে আছি, কি বল?

ট্যুরিস্ট বাংলোর রাঁধুনী বলে দিয়েছিল, আপনারা সকাল বেলাই পুষ্কর চলে যান, ইচ্ছে করলে ওখানেই স্নান-খাওয়া করে নিতে পারবেন। ওখানে খানাপিনার অনেক হোটেল আছে।

পুষ্কর-তীর্থের জন্যে সকাল-সকালই যাত্রা শুরু করলাম। আজমীর রেলস্টেশনের কাছ থেকে বাস ছাড়ছে কিছুক্ষণ পর-পরই। আজমীর থেকে মাত্র সাত মাইল।

বাসের চেহারা দেখে রুমী নাক সিঁটকে বলল—এই দেশলাইয়ের খোলে যেতে হবে?

—তা হবে। কে এখানে লীল্যাণ্ড বাস নিয়ে বসে আছে? পুষ্কর যাবার যে পথ সেখানে বড় বাস যাবার উপায় নেই।

আমাদের যাত্রা শুরু হল। কণ্ডাক্টার যত পারে ঠাসাঠাসি করে যাত্রী নিয়েছে। মাঝ-পথেও কয়েক জন যাত্রী উঠল। মুর্গীঠাসা হয়ে সব চলেছে। লম্বা লম্বা লোকগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ঘাড় সোজা করতে পারছে না, পাছে বাসের ছাদে মাথা ঠুকে যায়। তাতে কি আছে, ওদের যাওয়া নিয়ে কথা। কিছুক্ষণ বাদে ডানদিকে আনা সাগরের জলরাশিকে দেখতে পেলাম। এখন আমরা আনা সাগরকে অর্ধ-চক্রাকারে পরিক্রম করে নাগপাহাড়ের কোলে এসে গেছি। গতকাল আমরা আনা সাগরের শ্বেত-পাথরে চবুতরে বসে ওপারে এই নাগপাহাড়কে দেখেছিলাম। একজন বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম পুষ্করে যাবার পথ ভারি সুন্দর। দু'পাশে পাহাড় উঠে গেছে। তার মধ্যে সংকীর্ণ পথে যেতে যেতে নাকি 'খাইবার পাস'কে মনে পড়ে। খাইবার পাস কখনও দেখি নি, বর্ণনা পড়েছি। খাইবার পাস দিয়েই যেন চলেছি কল্পনা করে আনন্দ পেলাম। সংকীর্ণ পথে পাশাপাশি দুটো গাড়ি যাওয়া মুস্কিল। তাই বিপরীতমুখগামী গাড়িরা থেমে পরস্পরকে পথ দিতে দিতে এগিয়ে চলল। ঘণ্টাখানেক পরে সে পথ গেল ফুরিয়ে। দূরে লোকালয় দেখা গেল। গাড়ি নীচে নামছে। সমতলে নেমে সামান্য কিছুটা দৌড়ে এসে বাস থামল স্ট্যাণ্ডে।

সামনের সোজা পথটাই পুষ্কর হ্রদের দিকে চলে গেছে। নামবার সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডারা এসে ধরল। তবে ভারতের অন্যান্য তীর্থ থেকে পাণ্ডার সংখ্যা

এখানে কম বলে মনে হল। হয়তো এখন পুষ্করে মরসুম নেই বলেই পাণ্ডার সংখ্যা কম। কার্তিক পূর্ণিমায় এখানে বিরাট মেলা বাসে। তখন খুব জম-জমাট থাকে এ অঞ্চল। বগলে খাতা পাণ্ডারা যথারীতি এসে কেবল পদবিটা এবং কোথা থেকে আসছি শুধু এটুকুই বলবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তা হলেই খাতা দেখে বার করে ফেলবে আমরা তার যজমান কিনা। কিন্তু আমি ভাল করে জানি পুষ্কর হিন্দুদের মহাতীর্থ হলেও বাংলাদেশ থেকে সুদূর রাজপুতানার মরুতীর্থতে আমার কেউ কখনও তীর্থ করতে আসে নি। কাজেই আমার কোন আত্মীয়-স্বজন পাণ্ডাদের যজমান ছিল কিনা হাজার চেষ্টায়ও বেরোবে না। যাই হোক, লোক একজন দরকার। নতুন জায়গায় সঙ্গে একজন গাইড থাকলে কাজ দেয়, উটকো লোকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, উপরন্তু অনেক কিছু জানা যায়। একটি কিশোর ছেলে আমাদের গাইড হল। পুষ্কর হ্রদের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগল, সকল তীর্থের সেরা হল পুষ্কর তীর্থ। সকল তীর্থ বারবার কিন্তু পুষ্কর তীর্থ একবার। পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং এই তীর্থ রচনা করেছেন।

পাণ্ডা পরিচিতি দিয়ে যাচ্ছে। আমরা শুনতে শুনতে এবং চারদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। লোকবসতি কম বলে জায়গা ছোট হলেও জম-জমাট হয়ে আছে। চুনা পাথরের তৈরী ছোট ছোট খুপরি বাড়ি। বেশীর ভাগই পাণ্ডাদের। আর আছে ধর্মশালা মত যাত্রীদের থাকবার ঘর। ছোট ছোট দোকান আছে অনেক, তার মধ্যে খাবারের দোকানই বেশী। সে সব দোকানে দুধ, প্যাঁড়া, লাড্ডু তো আছেই, আর আছে সেউ, ভুজিয়া, চা, কোকাকোলা, পুরি ইত্যাদি। পাণ্ডার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমরা বিশাল পুষ্কর হ্রদের প্রশস্ত শান বাঁধান ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। আমরা যেটি পুষ্কর হ্রদ বলে জানি সেটি জ্যেষ্ঠ পুষ্কর। ঐ রকম আরও দুটি হ্রদ ওর কাছাকাছি আছে। মধ্যম পুষ্কর ও কনিষ্ঠ পুষ্কর। তবে প্রধান তীর্থ গড়ে উঠেছে জ্যেষ্ঠ পুষ্করেরই ধারে। ব্রহ্মা ত্রিলোকে নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করবেন, বিষ্ণু ও মহাদেবের পরামর্শে তাই যজ্ঞ করবেন। ব্রহ্মা ভাবতে ভাবতে চলেছেন কোথায় যজ্ঞ-স্থান হবে। হাতে ছিল পদ্ম ফুলের গুচ্ছ, সেখান থেকে তিন জায়গায় তিনটি ফুল খসে পড়ল। যেখানে যেখানে কর থেকে পুষ্প খসে পড়ল সেখানে সেখানে জন্ম নিল পুষ্কর হ্রদ। পুষ্প কর থেকে পড়ে হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল বলে নাম হল পুষ্কর। জ্যেষ্ঠ পুষ্করের ধারেই ব্রহ্মা যজ্ঞস্থল নির্বাচন করলেন। আয়োজন হল যজ্ঞের। যজ্ঞের সময় সমুপস্থিত। ইন্দ্র ইন্দ্রানীকে নিয়ে, শিব শিবানীকে নিয়ে, নারায়ণ নারায়ণীকে নিয়ে, এই ভাবে সব দেবতারা সস্ত্রীক উপস্থিত হয়েছেন!

কিন্তু যিনি প্রধান হোতা সেই ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কোথায়? তিনি এখনও উপস্থিত হন নি। ব্রহ্মার পুত্র নারদের ওপর ভার পড়ল মাকে ডেকে আনবার। নারদ মাকে খবর দিল তাড়াতাড়ি আসতে, কারণ যজ্ঞ-সময় পার হয়ে যায়। ব্রহ্মাণী সাবিত্রী একটু ব্যস্ত ছিলেন। যজ্ঞে যাবার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। নারদ সাবিত্রীকে খবর দিয়ে এসে একটু মজা করল, পিতা ব্রহ্মাকে বলল, মা ব্যস্ত আছেন, এখন আসতে পারবেন না। ব্রহ্মা দেখলেন মহা বিপদ—যজ্ঞ পণ্ড হয়ে যায় বুঝি! সস্ত্রীক যজ্ঞ করার নিয়ম। যজ্ঞের সময়ও পার হয়ে যায়। অতএব নান্যঃ পন্থাঃ। দ্বিতীয় বিবাহ করে কাজ শেষ করা ছাড়া উপায় কি? পাত্রী খোঁজা শুরু হল। পাওয়া গেল একটি সুলক্ষণা কন্যা, কিন্তু সে গোয়ালার মেয়ে, ঘোল দই মাঁথায় নিয়ে চলেছে। ব্রহ্মার পাত্রা হিসাবে তাকেই আনা হল। গোয়ালার মেয়ে ব্রহ্মার স্ত্রী হবে কি করে? তখন মেয়েটিকে গরুর মুখ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ল্যাজের কাছ থেকে বার করে নেওয়া হল। মেয়েটি শুদ্ধ হয়ে গেল। নাম হল গায়ত্রী, ইনি হলেন ব্রহ্মার দ্বিতীয় স্ত্রী। স্কন্দপুরাণে আছে কিন্তু অন্য কথা; বেদ-জননী গায়ত্রী গান-কর্তাকে ত্রাণ করেন বলে তাঁর নাম গায়ত্রী হয়েছে। গায়ত্রীকে নিয়ে ব্রহ্মা বসলেন যজ্ঞ করতে। এদিকে সাবিত্রী এসে দেখলেন ব্রহ্মা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। সাবিত্রী রেগে আগুন হলেন। ব্রহ্মাকে শাপ দিলেন, যেমন তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে আমায় দুঃখ দিলে তেমনি তোমার যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং এই পুষ্কর ছাড়া কোথাও তোমার পূজো হবে না। এই বলে সাবিত্রী একটি পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা-মগ্ন হলেন। আমরা দেখলাম পুষ্কর হ্রদের অদূরে সেই পাহাড়কে। পাহাড়ের শীর্ষে সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে। ব্রহ্মাকে যজ্ঞে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে যে যে দেবতারা সাহায্য করেছিলেন সাবিত্রী তাঁদেরও রেহাই দেন নি। প্রত্যেককেই শাপ দিয়েছিলেন। বিষ্ণুকে শাপ দিলেন—আপনি মানুষ হয়ে জন্মাবেন এবং আপনার স্ত্রীকে তখন রাবণ রাক্ষস হরণ করে নিয়ে যাবে। শিবকে শাপ দিলেন—আপনি ভস্ম মেখে ভূত-প্রেতের সঙ্গে কাল কাটাবেন এবং লিঙ্গহীন হবেন। ইন্দ্রকে শাপ দিলেন—আপনি যুদ্ধে কখনও জয়ী হবেন না এবং দানবদের জন্যে স্বর্গে ভয়ে ভয়ে থাকবেন। পবনকে শাপ দিলেন—আপনি দুর্গন্ধও বয়ে বেড়াবেন। অগ্নিকে শাপ দিলেন—আপনি সব কিছুই খেয়ে বেড়াবেন। তাঁর অভিশাপ থেকে ব্রাহ্মণরাও বাদ পড়ল না। তাদের এই বলে শাপ দিলেন—আপনাদের অপরের বৃথা দান গ্রহণ করতে হবে এবং বৃথা বনাশ্রয়ী হতে হবে। দেবীরাও বাদ গেলেন না। কেন তাঁরা সাবিত্রীর পক্ষ নেন নি এই জন্য তাঁরাও অভিশপ্ত হলেন। লক্ষ্মীকে বললেন, লক্ষ্মী কখনও এক জায়গায় থাকবেন না, চঞ্চল হবেন এবং অধর্মের ঘর হবে তাঁর

ঘর। ইন্দ্রানীকে বললেন, নহুষ কর্তৃক প্রার্থিতা হয়ে ভয়ে বৃহস্পতির গৃহে লুকিয়ে থাকবেন। এ ছাড়া অন্যান্য দেবীদের সন্তানহীন হবেন বলে শাপ দিলেন।

পাণ্ডা ছেলেটি বলল—আগে পুষ্কর হ্রদে ব্রহ্মার পূজো দিন তারপর মন্দিরাদি দর্শন করবেন, এখানে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান মহাকর্তব্য।

দেখলাম অনেকেই শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করছে। রামচন্দ্র বনবাসের সময়ে এখানে দশরথের পিণ্ডদান করেছিলেন। পাণ্ডা ছেলেটি ভালই। বললে—পুষ্করের হ্রদে যদি স্নান সেরে নিতে চান নিতে পারেন। নয়তো হাতমুখ ধুয়ে নিন, আমি পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে আসছি।

একটু পরেই থালাতে ফল-মিষ্টি-নারকোলের নৈবেদ্য নিয়ে এল। কাকচক্ষু ঠাণ্ডা জলে হাতমুখ ধুয়ে খুব তৃপ্তি পেলাম। পাণ্ডা মন্ত্র পড়তে লাগল, আমরা জলে হাত ডুবিয়ে সেই মন্ত্রর পুনরাবৃত্তি করতে লাগলাম। জলে রাশি রাশি মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। হাত ডুবালেই ধাক্কা মারছে। পাণ্ডার নির্দেশমত ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে ফুল মিষ্টি জলে ফেলে দিলাম। নারকোলটাও ফেলতে যাচ্ছিলাম, পাণ্ডা ক্ষিপ্রভাবে বাধা দিল, বললে—আমার হাতে দিন, জলে ফেলবেন না।

পূজো শেষে পাণ্ডাকে বিদায় দিলাম। এবার আমরা নিজের মত ঘুরব। পুষ্করে আছে বাহান্নটি ঘাট। বিভিন্ন সময়ে রাজা-মহারাজারা তৈরি করিয়েছিলেন। পুষ্করে মন্দিরের সংখ্যা চারশ। দর্শনার্থীরা কিন্তু এত মন্দির খুঁজে পাবে না। পাবার দরকারও নেই। গুটি-পাঁচেক বড় মন্দির আছে, তাই দেখলেই যথেষ্ট। আছে বরাহের মন্দির, অষ্টপটেশ্বর মন্দির, রঙ্গনাথের দুটি মন্দির ও ব্রহ্মার মন্দির। ব্রহ্মা-মন্দিরই মূল মন্দির। এ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন শঙ্করাচার্য। বর্তমানে যে মন্দিরটিকে সংস্কৃত ও সুন্দর অবস্থায় দেখি সেটি কিন্তু বেশীদিনের নয়, প্রায় দু'শ বছরের। নতুন বিরাট রঙ্গনাথের মন্দিরটি বহু মুদ্রা ব্যয়ে নির্মাণ করেছেন মাগনারামজী ভাঙ্গুড়। রাজস্থানের একমাত্র এই মন্দিরটিতে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতির ছোঁয়া লেগেছে।

পুষ্কর দেখা সেরে ফেরবার বাসে এসে বসলাম। বেলা প্রায় দুটো। ফিরে চলেছে অনেকে। এদের মধ্যে অনেককেই চিনলাম, এক বাসে আজমীর থেকে এসেছি। সকলের মুখে প্রসন্নতা। আমি তীর্থ করতে আসি নি, বেড়াতে এসেছি। কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়? অবচেতন মন পুষ্করকে মহাতীর্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছে, মন শান্তিতে ভরে গেছে। বাসে বসে বসে পুষ্করের কথা ভাবছি আর অপেক্ষা করছি কখন গাড়ি ছাড়ে। এমন সময়ে সাত-আটজনের একটি দল এসে উপস্থিত। সকলেই মেয়ে। এই বাসেই তারা আজমীর ফিরবে। অল্প-বিস্তর হাঁফাচ্ছে এরা সবাই, কিন্তু খুশীতে ডগমগ। দলে দু-তিনজন বয়স্কা মহিলাও আছে। পরিবেশ শান্ত

ছিল। কিন্তু মেয়ের দলটি এসে ভোরের পাখিদের মত কিচমিচ করে চারদিক মুখর করে তুলল। একটি মেয়ে একজন বয়স্কাকে কৌতুক করে বলল—শিখাদি, তুমি ফিরেছো তাহলে?

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে আর একজন বলে উঠল—সত্যি, শিখাদির যা অবস্থা হয়েছিল ভেবেছিলাম সাবিত্রী পাহাড়েই বোধ হয় ওনার শেষ শয্যা।

শিখাদি মোটেই দমবার পাত্রী নয়। বলল—মন্দ কি? না হয় সাবিত্রী পাহাড়ে দুটো সাবিত্রী-মন্দির হত। প্রথমোক্ত মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল—ব্রহ্মা কোথায়? এবার তাহলে কলকাতায় ফিরে গিয়ে একটি ব্রহ্মা যোগাড় করতে হবে। আমাদের নজর শিখাদির সিঁথিতে পড়ল। না, সিঁথি খালি। ওদের কথাবার্তায় বোঝা গেল ওরা সাবিত্রী পাহাড়ে উঠেছিল। সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠা কষ্টসাধ্য। সাবিত্রী পাহাড়কে পুষ্করের খুব কাছে মনে হলেও তার কাছে যেতে অনেকখানি মরুভূমি পার হয়ে যেতে হবে। এর পর তিন ঘণ্টা হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হবে; আর নামতে লাগবে দু'ঘণ্টা। অনেক সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। মেয়েগুলোর ক্ষমতা আছে!

আজমীর থেকে রাত আটটায় চিতোরগড় যাবার গাড়ি; খাণ্ডোয়া লোকাল। সেটায় চড়লাম। রাত দেড়টায় চিতোরগড়ে এসে নামলাম। বড় স্টেশন। অত রাতে লোক কম, কিন্তু প্রশস্ত স্টেশন, আলো ঝলমল করছে! থাকবার জায়গা একটা যোগাড় করা দরকার। এই গভীর রাতে হোটেল খুঁজে ওঠা মুস্কিল। অবশ্য নিরাপত্তার প্রশ্নও আছে। রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমই একমাত্র নিরাপদ। মোটা মোটা টাকা দিয়ে হোটেলে না উঠে যেখানে রিটায়ারিং রুমের ব্যবস্থা আছে সেখানেই ওঠা ভাল। অল্প পয়সায় থাকবার সব সুবিধে পাওয়া যায়। আর ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থা তো কাছেই থাকে। আজমীর-খাণ্ডোয়া মিটার গেজ লাইনের মধ্যে চিতোরগড় জংশন। এখান থেকে যোধপুর, রেওয়ারি, উদয়পুর, খাণ্ডোয়া, আজমীর সব জায়গায় যাবার সুবিধে আছে। সে রাত্রির মত চিতোরের রিটায়ারিং রুমে বিশ্রাম নিলাম। সুন্দর ঘর। পরিপাটি খাট-বিছানা, ড্রেসিং-আয়না, চেয়ার, টেবিল। পোশাক বদলাবার আলাদা ঘর আছে, সব কি টিপটপ! জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রুমী বলল—বেশ ভাল জায়গা পেয়েছি।

স্টেশনের দরোয়ান এসে বলে গেল—আপনারা আরাম করুন। সকাল আটটায় আমার ডিউটি শেষ হবে। যে লোক এর পর ডিউটিতে আসবে বলে যাব তাকে, আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। যা যা দরকার ওকে বলবেন, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।

লোকটা চলে গেল। আমরা হাতমুখ ধুয়ে নিদ্রা দেবীর আশ্রয় নিলাম। এত রাতে স্টেশনে গাড়ির আনাগোনা বিশেষ নেই; কিন্তু সান্টিং ও মারশালিংয়ের শব্দ সমানেই চলতে লাগল। লোহা-লক্কড়ের ঝনঝনানি আর ইঞ্জিনের শাঁ শাঁ শুনতে শুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পারমার বংশের মৌর্য রাজকুমার চিত্রং মোরি চিত্রকূট নামে একটি নগরের পত্তন করেন। সেই নাম থেকেই চিতোর নামের উৎপত্তি। কেউ কেউ বলে চিত্রকূট পাহাড়ে এক রকম পাথর পাওয়া যায়, একটু কালচে রঙের, তার নাম চিত্তোড়। তার থেকেই নাকি চিতোর নাম। মৌর্য চিত্রং-এর পর কতজন রাজা চিতোরের সিংহাসনে ছিলেন জানা যায় না, তবে রাজপুতানার মানসরোবরে প্রাপ্ত ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি লিপির উল্লেখ করে টড সাহেব বলেন, চিত্রং-এর পরে আরও জন চারেক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন মহেশ্বর, ভীম, তাঁর ছেলে ভোজ এবং ভোজ-রাজের ছেলে মোন। চিতোরের ইতিহাস কায়েম হয় বাপ্পা রাওলের পর থেকে। ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে গোহিলোট গোষ্ঠীর বাপ্পা রাওল মোনের কাছ থেকে চিতোর দুর্গ অধিকার করে মেবারের রাজধানী চিতোরগড় করেন। প্রায় ন'শো বছর ধরে চিতোর রইল মেবারের রাজধানী। ১৫৬৭ সালে আকবর চিতোর জয় করে নিলে উদয়সিং চিতোর থেকে ৭০ মাইল দূরে আর একটি শহর পত্তন করে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নতুন রাজধানীর নাম হল উদয়পুর।

চিতোরগড়ের ইতিহাসই রাজপুতানার ইতিহাসকে করেছে উজ্জ্বল। মেবারের শৌর্য, বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মবলি রাজপুতানাকে করেছে রত্নভূষিত। রাজস্থানের বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে চিতোরগড়ে এসেই সকলের রাজস্থান-চিন্তা আটকে থাকে। রাজপুত পুরুষের নাম করতে বললে লোকে নাম করে রাণা কুম্ভ, সঙ্গ, জয়মল, পত্ত, উদয়সিং, প্রতাপের। রাজপুত রমণীর নাম স্মরণ করতে বললে স্মরণে আসে কর্ণবতী, পান্না, মীরাবাই, পদ্মিনী। এনারা সবাই তো চিতোরেরই।

চিতোরের ভাগ্যে কেবল সংগ্রাম আর সংগ্রাম। কখনও দিল্লীর দিক থেকে, কখনও গুজরাটের দিক থেকে। বাপ্পা রাওলের থেকে গোহিলোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। গোহিলোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চিতোরে অনেক যুদ্ধ অনেক আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু মোগল আক্রমণগুলোই ছিল ধ্বংসাত্মক। ইতিহাসে মোগল আক্রমণগুলো রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে আছে। বারবার মোগল বাদশারা এসে চিতোরকে আক্রমণ করেছে, বিপর্যস্ত করেছে। ধূলো করে দেবার চেষ্টা করেছে। আর চিতোরের বীরেরা আবার তাদের হাত থেকে চিতোরকে উদ্ধার করে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রত্যেকবারই কতশত বীর প্রাণ দিল। কত সম্পদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অগণিত রাজপুত রমণীরা সম্মান রক্ষার জন্যে আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জহরব্রত পালন করল।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দিক থেকে ছুটে এলেন আলাউদ্দিন খিলজী। দুর্ধর্ষ বীর, নিজেকে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করতেন। দীর্ঘদিন অবরোধ করেও আলাউদ্দিন পারলেন না চিতোরের কেল্লায় প্রবেশ করতে। দুর্ভেদ্য চিতোর। চিতোরের সিংহাসনে তখন রাওল রতনসিং—পদ্মিনীর স্বামী। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল চিতোরকে জয় করে পদ্মিনীকে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু মাসের পর মাস চিত্রকূট পাহাড়কে চারদিকে ঘিরে অবরোধ করে রেখেও কেল্লার একটি পোলও (দেউড়ি) খোলাতে পারলেন না, তখন একটি নতুন ফন্দি আঁটলেন। আলাউদ্দিন বলে পাঠালেন, তিনি বরাবর শুনে আসছেন, বিশ্বে পদ্মিনী নাকি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তাঁকে একটিবার মাত্র চোখে দেখতে চাই। অত দূর দিল্লী থেকে আসা কি বিফল হবে? রতনসিং পড়লেন চিন্তায়। কি করবেন। পরপুরুষের সামনে রাজপুত রানী তো আসতে পারেন না! রতনসিং ভাবতে লাগলেন। আলাউদ্দিনকে তখনই কোন জবাব দিলেন না। এদিকে আলাউদ্দিন জবাবের অপেক্ষা করে করে যেন ক্ষেপে উঠলেন। ঠিক আছে, দুর্গের ভেতর না ঢুকতে পারি চিতোরের নগরে প্রজারা তো আছে। চালাও তাদের ওপর আক্রমণ। চলল তাদের ওপর আক্রমণ। চিতোর দুর্গে বসল জরুরী বৈঠক। এমন ভাবে প্রজাদের অত্যাচারিত হতে দেওয়া যায় না। তার থেকে একবার পদ্মিনীর দর্শন পেয়ে যদি আলাউদ্দিন ফিরে যায়, তাই করা উচিত। আলাউদ্দিনের কাছে চিতোর দুর্গ থেকে দূত এল—আলাউদ্দিনের প্রস্তাবে রতনসিং রাজী। বাদশা পদ্মিনীর দর্শন পাবেন।

বাদশাকে আনা হল পদ্মিনীর প্রাসাদে। অধীর আগ্রহে আলাউদ্দিন খিলজী অপেক্ষা করতে লাগলেন, পৃথিবীর দুর্লভতম সম্পদটিকে আজ দেখা যাবে। আলাউদ্দিনকে বলা হয়েছিল যেন তিনি একা আসেন। বাদশা একাই এসেছেন। তাঁকে ঘিরে আছে চারজন রাজপুত সর্দার। বাদশার সন্দেহ হল রতনসিং তাঁকে ফাঁদে ফেলেন নি তো? কিন্তু না, রাজপুত রাজারা কাপুরুষের কাজ করবে না। খবর এল—বাদশা এবার পদ্মিনীর দেখা পাবেন, কিন্তু সোজাসুজি নয়, ঐ যে সামনে বিরাট ঝকঝকে আয়না আছে তার ভেতর দিয়ে। যে সর্দাররা বাদশাকে ঘিরেছিল তারা বলল, আয়নার ভেতর দিয়ে পদ্মিনীকে দেখবেন। কিন্তু খবরদার! ঘাড় ফিরিয়ে সোজাসুজি দেখবার চেষ্টা করেছেন কি তরোয়ালের একটি ঘায়ে কাঁধ থেকে মাথা আলাদা হয়ে যাবে।

পদ্মিনী এসে দাঁড়ালেন জলমহলের সোপানশ্রেণীর ওপরে। তাঁর প্রতিফলন আলাউদ্দিন দেখলেন আয়নায়। তিনি চোখ ফেরাতে পারলেন না। লোকমুখে যা শোনা গিয়েছিল মিথ্যে নয়! একটু দাঁড়িয়ে পদ্মিনী জলমহলে আবার ঢুকে গেলেন। মিলিয়ে গেল আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব। এতক্ষণ আলাউদ্দিন মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়েছিলেন। সম্বিৎ পেয়ে এবার ফিরে চললেন শিবিরে। অতিথিকে এগিয়ে দেওয়া শাস্ত্রের নিয়ম। পদ্মিনীর স্বামী রাণা রতনসিং চললেন বাদশাকে এগিয়ে দিতে। আলাউদ্দিন বললেন, আমি যেমন একলা নিরস্ত্র তোমার দুর্গে এসেছিলাম তুমিও সেইভাবে আমাকে পৌঁছে দিতে শিবিরে যাবে। মুহূর্তের জন্যে রতনসিং ভ্রূ কোঁচকালেন, কিসের একটা সন্দেহ বুঝি তাঁর মনে উঁকি দিল। তথাস্তু। তাই হল। কিন্তু রতনসিংয়ের মুহূর্তের সন্দেহই হল সত্যি। তিনি নিরস্ত্র একলা বাদশার শিবিরে বন্দী হলেন। রতনসিং আলাউদ্দিনকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন রতনসিংকে আলাউদ্দিন সে মর্যাদা দিলেন না তো! দিল্লীর বাদশাহের এ নিমকহারামি যুগে যুগে। ভয় দেখালেন আলাউদ্দিন, যদি পদ্মিনীকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া না হয় তাহলে রতনসিংকে হত্যা করা হবে। চিতোর দুর্গের ওপার থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। কিছুদিন কাটল এইভাবে। তারপর রতনসিংকে মুক্ত করতে একদিন চিতোর দুর্গের ফটক খুলে গেল। আলাউদ্দিন জয়লাভ করলেন। কিন্তু যে পদ্মিনীর জন্যে এত কাণ্ড, কোথায় সে পদ্মিনী! চিতোরের পতন অবশ্যম্ভাবী জেনে পদ্মিনী অন্যান্য পুরনারীদের নিয়ে অনেক আগেই জহরব্রত পালন করেছেন।

আলাউদ্দিন দিল্লী ফিরে গেলেন। পুত্র খিজির খাঁর ওপর মেবার শাসনের ভার দিয়ে গেলেন। চিতোরের নাম তখন হল খিজিরাবাদ। বীর হাম্বীর চিতোরকে পরে উদ্ধার করে আবার মেবারের রাজধানী করেন।

১ ৩৩ সালে মেবারের আকাশ আবার কালো হয়ে উঠল, গুজরাটের বাহাদুর শাহ চিতোর আক্রমণ করে দখল করলেন। এই সময়ে উদয়সিংয়ের মা কর্ণবতীর কাহিনী ও হুমায়ুন এসে কিভাবে বাহাদুর শাহকে চিতোর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সে কথা রাজস্থানে আসবার আগেই রুমী বলে দিয়েছে। তারপর চিতোরের রাণা হয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের কথা ঐতিহাসিকরা বলুন। উদয়সিং রাজা হলেন, রাজা কেন বলি, বলি রাণা হলেন ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে। মেবারের রাজারা হলেন রাণা।

উদয়সিংয়ের কথা একটু বলি। উদয় সিং যখন খুব ছোট অর্থাৎ রাণা হবার বয়স হয় নি তখন মেবারের রাজপুরুষরা দাসীপুত্র বনবীরকে শাসক করে রেখে রাজ্য চালাতেন। বনবীর পথ পরিষ্কার রাখবার জন্যে উদয়সিংকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু উদয়ের ধাইমার কৌশলে উদয়ের জীবন রক্ষা

পায়। ধাইমা পান্না রাণার বংশকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করে নিমকের দাম দিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে উদয়ের বিছানায় শায়িত পান্নার ছেলেকে উদয় ভেবে বনবীর হত্যা করে নিশ্চিন্ত মনে যখন চলে গেল রাজপুত্র উদয়সিং তখন একজন বিশ্বস্ত রাজপুত কর্মচারীর সঙ্গে পৌঁছে গেছেন অনেক দূর—কমলমীরের দুর্গে। কমলমীরে আশা শাহের ভাইপো হয়ে উদয়সিং মানুষ হতে লাগলেন। রাণা হবার মত যখন বয়স হল রাজপুত সর্দাররা উদয়সিংকে সেখান থেকে এনে মেবারের সিংহাসনে অভিষেক করলেন। বেগতিক বুঝে বনবীর দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। আর ফেরে নি কোনদিন।

তৃতীয়বার চিতোর আক্রান্ত হয় রাণা উদয়সিংয়ের সময়ে। ১৫৬৭ সালে আকবর চিতোর আক্রমণ করেন। উদয়সিং পরাজয় নিশ্চিত জেনে চিতোর ছেড়ে পালিয়ে যান। উদয়সিং-এর ছেলে রাণা প্রতাপসিং আপ্রাণ যুদ্ধ করে যেতে লাগলেন আকবরের হাত থেকে চিতোরকে মুক্ত করতে। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতেন আর শক্তি সঞ্চয় করে মাঝে মাঝেই মোগল-বাহিনীকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করতে লাগলেন। তাঁর একমাত্র পণ চিতোরকে উদ্ধার করা। যতদিন তিনি চিতোরকে উদ্ধার করতে না পারবেন ততদিন পাতায় আহার করবেন এবং তৃণশয্যা ছাড়া শোবেন না—এ ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা সকলেই জানে। আমৃত্যু এ প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করে গেছেন। কিন্তু হায়! চিতোরকে শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার করতে পারেন নি। চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ছাড়া সমস্ত মেবার তিনি উদ্ধার করেছিলেন।

চিতোরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বার বার মনে হয় এ এক তীর্থভূমি। রাজপুতানার অসংখ্য বীরের জন্মভূমি এই চিতোর, অসংখ্য সতী-নারীর সতীত্ব রক্ষার সাক্ষী চিতোর, যারা শত্রুর হাতে সতীত্ব লাঞ্ছিত হতে না দেবার সংকল্পে স্বামীদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে শিশু পুত্র-কন্যাদের হাত ধরে হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। এই সব বীর এবং বীরাঙ্গনাদের সংকল্পই ছিল, দেশকে শত্রুর হাতে কলুষিত হতে দেব না। চিতোরের মাটির কাছে যে কোন বস্তু, যে কোন সম্পদই মূল্যহীন। এইজন্যে তারা নিমেষে শোণিত ঢেলে তর্পণ করতে পারত হাসি মুখে। প্রাণ দিয়ে নৈবেদ্য সাজাতে পারত অনায়াসে। চিতোর দুর্গের বাইরে মেবারের বীরদের অসি চালনার কি প্রচণ্ড ঝনঝন শব্দ, আর ভেতরে সতী-নারীদের সতীত্বের একমাত্র রক্ষাকর্তা পাবকের দাউ দাউ শিখার কি দারুণ হু-হু শব্দ! সেই প্রচণ্ড শব্দে মাথা ঝিমঝিম করছে। দেহ অবশ হয়ে আসছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হঠাৎ উঠল প্রচণ্ড রকম দুলে। সে কি প্রচণ্ড ভূমিকম্প! নিমেষে চিতোরগড় হয়ে গেল মরুময়।

ঘুম ভেঙে গেল। রুমী আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। চোখ খুলে দেখলাম ওর

মুখে চোখে আতঙ্কের চিহ্ন। কি ব্যাপার! অচেনা নতুন জায়গা, ভয় পেল নাকি?

উঠে বসলাম—কি ব্যাপার?

রুমী বলল—তোমার কি ব্যাপার? গোঙাচ্ছিলে কেন? সারা গা'ও দেখছি ঘামে ভিজে গেছে।

বললাম—কিছু না, স্বপ্নে চিতোরগড়ে হারিয়ে গেছলাম।

ঘণ্টা দুয়েকেই চিতোর দুর্গ দেখা শেষ হয়ে গেল। চিতোরের রেল-স্টেশনের কাছেই বনস্ নদী। সেটি পার হলেই চিত্রকূট পাহাড় যেন হঠাৎ সামনে এসে পড়ে। ৫০০ ফুট পাহাড়ের ওপরে সাড়ে তিন মাইল উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সমতল জায়গায় ৬৯০ একর এলাকা জুড়ে চিতোরের কেল্লা। রাজস্থানের সব থেকে প্রাচীন কেল্লা। সব থেকে যেমন প্রাচীন, ধ্বংস হয়েছেও সব থেকে বেশী। পদ্মিনীর জলমহল, কুম্ভশ্যাম মন্দির ও অপেক্ষাকৃত উত্তর-কালের কীর্তিস্তম্ভ ও বিজয়স্তম্ভ ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট নেই বলা যায়। সবই কল্পনায় দেখতে হবে। মিত্র আজমীরে ঠিকই আমাদের বলেছিলেন, চিতোরকে কল্পনায় দেখতে হবে। দুর্গের দুটি জিনিস রুমীর খুব বেশী ভাল লেগেছে। একটি পত্তের সমাধি, অন্যটি কুম্ভশ্যাম মন্দির। পত্তের সমাধি বিস্ময় আনে। আকবর যখন চিতোরকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেছেন তখন ষোল বছরের বীর সেনাপতি পত্ত সেই বিরাট মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ করেছে। সদ্য পরিণীতা বধূকেও পরিয়েছে যোদ্ধবেশ। বলেছে—তুমিও আমৃত্যু লড়াই কর। চিতোরের এই দুঃসময়ে রাজপুত বাহিনীকে পরিচালনার দায়িত্ব একলা আমারই ওপর এখন। রাঠোর সেনাপতি বীর জয়মল আর ইহলোকে নেই। মা আমাকেই সেনাপতির উষ্ণীষ পরিয়েছেন দেখ। অতএব সে পবিত্র দায়িত্ব আমাকে পালন করতেই হবে। তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আমাকে প্রেরণা দাও।

পত্ত দিশেহারা হয়ে মহা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। ষোল বছরের কিশোর সেনাপতির বীরত্ব দেখে সেদিন আকবর মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পত্ত বেঁচে থাকলে চিতোরের ভাগ্যে পরাজয় আসত কিনা কে জানে! কিন্তু একটি হাতি অকস্মাৎ এসে পত্তকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে মেরে ফেলল। হায় হায়! চিতোরের সব ভরসা নিভে গেল। যেখানে পত্ত প্রাণ হারিয়েছিল সেখানে, দুর্গের প্রধান ফটক রামপোলের পূর্ব পাশেই আছে পত্তের সমাধি। কৈলবারার রাজা পত্ত চন্দ্রাবৎ কুলের অন্যতম শাখা জগবৎ গোত্রের সব থেকে বড় বীর। শিশুকালেই পত্ত পিতৃহারা। পত্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জগবৎ বংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কারণ পত্তই একমাত্র বংশধর।

তা হোক, পত্তের বীর মাতা তবু তাঁকে পাঠালেন যুদ্ধক্ষেত্রে। যদি পত্ত শেষ হয়ে যায় তবু সান্ত্বনা থাকবে, দেশমাতাকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে পত্ত যে বীরত্ব দেখিয়ে প্রাণ দিল সে রকম বীরত্ব রাজপুত ইতিহাসে বিরল। মেবারের ঘরে ঘরে জয়মল আর পত্তের বীরত্ব-গাথা এখনও শোনা যায়।

রুমীর ভাল লাগার দ্বিতীয় বস্তুটি হল কুম্ভশ্যামের মন্দির। রাণা কুম্ভের ঘরণী মীরাবাই গিরিধারীর ধ্যানে এখানে দিনরাত কাটাতেন। মেরথার সামান্য রাঠোর সীমান্ত-রাজার মেয়ে মীরাবাই, কত আদর-যত্ন করে রাণা কুম্ভ আনলেন মেবারের রানী করে। সেই মীরাবাই কিনা রাত দিন গিরিধারীর চিন্তা করে! কুম্ভের প্রাসাদ তার ভাল লাগে না? এই জন্যে মীরাবাইকে প্রথম প্রথম অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। মীরার গিরিধারী-প্রেম কিন্তু বেড়েই গেছে।

রাণা কুম্ভ পরে বুঝেছিলেন তাঁর প্রাসাদে থাকবার জন্যে মীরাবাই নয়। তখন তিনি প্রাসাদের অদূরেঁ বানিয়ে দিলেন শ্যামসুন্দরের মন্দির। নাম তাই কুম্ভশ্যাম মন্দির। তার পাশেই করে দিলেন আর একটি ছোট মন্দির —মীরাবাইয়ের মন্দির। মীরাবাইয়ের সময়ে কুম্ভশ্যাম মন্দিরে ছিল দুটি গিরিধারীর মূর্তি, একটি সোনার, অপরটি কষ্টি-পাথরের। সে মূর্তি দুটি এখন এ মন্দিরে দেখা যাবে না। সে দুটিকে রাখা আছে উদয়পুর প্রাসাদের খাসমহলে।

মীরাবাইয়ের জীবনী নিয়ে সব ঐতিহাসিকরা এক মত হতে পারেন নি। রাজস্থানের ইতিহাসে কর্ণেল টড দেখিয়েছেন রাণা কুম্ভের স্ত্রী হলেন মীরাবাই। একদল ঐতিহাসিক বলেছেন, এ খবর ঠিক নয়। রাণা সঙ্গের ছেলে কুমার ভোজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। যোধপুর রাজ্যের মেরথা তালুকের কুড়কী গ্রামে আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে মীরাবাইয়ের জন্ম হয়। রাঠোর দুদাজীর ছেলে রতনসিংয়ের মেয়ে। বৈধব্যের পর অবিরত সাধুসঙ্গ ও নামগানে মগ্ন থাকতেন। রাজপরিবারের লোকেরা তাঁর এই ভাব পছন্দ করতেন না, ফলে পারিবারিক সংঘর্ষ। কিংবদন্তী এই যে, রাণা বিক্রমজিত ও তাঁর বোন উদাবাই মীরাবাইকে বিষ খাইয়ে মারেন। ভক্তদের মতে মীরাবাই উপাস্য দেবতা রণছোড়জীর শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে যান। কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলে তিনি মেবার ছেড়ে বৃন্দাবন আসেন, সেখান থেকে দ্বারকায় গিয়ে দেহ রাখেন ১৫৬৩—৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।

আমার আর একটি জিনিস খুব ভাল লেগেছে, সেটি বিজয়-স্তম্ভ। কুম্ভের প্রাসাদের একটু দূরে সতীস্থল অর্থাৎ যে প্রান্তরে রাজপুত নারীদের দাহ করা হত তার পাশে একটি অপূর্ব কারুকার্যময় স্তম্ভ। এটি তৈরি করিয়ে

ছিলেন রাণা কুম্ভ। মালোয়ার মোহম্মদ খিলজীকে পরাজিত করে বিজয়-স্মৃতি স্বরূপ এই স্তম্ভ নির্মাণ করান। তাই এর নাম বিজয়-স্তম্ভ। স্তম্ভটি ন'তলা। পাদদেশ ত্রিশ ফুট চওড়া এবং, স্তম্ভটি উঁচু একশ' বাইশ ফুট। গায়ে হিন্দু পুরাণের অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা। স্থাপত্যের এ এক বিচিত্র নিদর্শন। এর গঠনরীতির কাছে পৃথিবীর যে কোন মিনার বুঝি পরাজিত। কর্ণেল টড একে কুতুবমিনারের থেকেও উৎকৃষ্ট বলেছেন। ফার্গুসন রোমের ট্রোজান টাওয়ারের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। ১৪৪০ থেকে ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দ এই চার বছর ধরে বিজয়-স্তম্ভ নির্মাণ হওয়ার পর তার অনবদ্য সৌষ্ঠব দেখে রাণা কুম্ভ সম্ভবতঃ আর একবার বিজয়ের স্বাদ অনুভব করলেন।

চিতোর দুর্গ দেখে আমরা টাঙায় করে ফিরে চললাম। যে টাঙায় এসেছিলাম তাতেই ফিরে চললাম। ও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ফেরার সময়ে সারা পথ রুমী মীরার ভজন 'ম্যায়নে চাকর রাখো জী' গাইতে গাইতে চলল। নিরিবিলি রাস্তায় ঘোড়ার খুরের একটানা খপখপ শব্দ, পাশে রণছোড়জীর চিন্তায় মাতোয়ারা রুমীর 'ম্যায়নে চাকর রাখোজী' ভজনের কলিগুলো আমার ভেতর ভরিয়ে তুলল।

চিতোরগড় ছাড়বার আগে একদিন বুঁদি ও কোটা ঘুরে এলাম। চম্বল নদীর উত্তর কূলে কোটা শহর আধুনিক হয়ে উঠেছে। কল-কারখানা রাস্তাঘাট আর চম্বল প্রোজেক্ট এই নিয়ে কোটা শহর। আধুনিক ইণ্ডাস্ট্রিয়াল শহর ক্লান্তি আনে, সবই প্রায় এক গোত্রের। কাজেই কোটায় দেখবার কিছু নেই। চিতোর থেকে কোটা ৯৬ মাইল। বাস যায়। তারপর বুঁদি ২৪ মাইল। বুঁদি জায়গাটা বরং দেখা চলে। চৌহান রাজা দেবার তৈরী ১৩৪২ সালের শহর বুঁদি। রাজা দেবা হলেন হারাবংশীয়। হারাবংশীয় কেল্লা ছিল রাজস্থানের দুর্ভেদ্যতম দুর্গের একটি। বুঁদির কেল্লা দেখতে দেখতে রুমী বলল—তোমার সেই কবিতাটা মনে পড়ছে—

"জলস্পর্শ করব না আর চিতোর-রাণার পণ,
বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাকবে যতক্ষণ।"

বললাম—হ্যাঁ, ছেলেবেলায় কবিতাটা কি ভালই লাগত। রোমাঞ্চিত হতাম —"হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি যোজন তিনেক দূর।"

আকবর যখন চিতোরগড় আক্রমণ করেন উদয়সিং জয়মল ও পত্তের ওপর চিতোরের ভার দিয়ে পালিয়ে গিয়ে নতুন নগর উদয়পুর গড়লেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, উদয়সিংয়ের এই রকম পালিয়ে যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে কাপুরুষতা মনে হলেও উদয়সিং পালিয়ে গিয়ে দূরদৃষ্টির

পরিচয়ই দিয়েছিলেন—কারণ তিনি বুঝেছিলেন চিতোর ধ্বংস হবেই। পালিয়ে যাওয়াতে রাণাবংশ রক্ষা পেল।

উদয়পুর—উদয়পুরকে বলে 'ছোট কাশ্মীর'। ইংরেজ পর্যটকরা বলে 'সিটি অব লেক্স্'। উদয়পুরে ঢুকলে প্রথমে তাই মনে হবে বটে। চারদিকে পাহাড় আর হ্রদ। পাহাড়ের বেষ্টনীতে উদয়পুর বাঁধা পড়েছে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে আছে দুটি বিরাট হ্রদ—'পিচোলা' আর 'ফতে সাগর'। এই হ্রদ দুটিকে জায়গা দিয়ে যেটুকু জায়গা ছিল সেখানে গড়ে উঠেছে শহর। শহরের বাইরে একটু দূরে দূরে আছে আরও কত হ্রদ, জয় সমন্দ, রাজ সমন্দ, উদয় সাগর।

টাঙাওয়ালাকে বলেছিলাম একটা হোটেলে নিয়ে যেতে। রাজস্থানের টাঙাওলা রিকশাওলাকে বিশ্বাস করা যায়। আগে আরও যেত। অন্য প্রদেশের লোক ওদের দেশে এসে ঐ জীবিকা গ্রহণ করে এখন একটু অসাধু করে দিয়েছে। থাকবার খাবার জায়গা যদি মোটামুটি মনের মত পাওয়া যায় তো বড় তৃপ্তি। অনেকে বলে বেড়াতে বেরিয়ে কোথায় থাকলাম কোথায় খেলাম তা নিয়ে মাথা ঘামাবার অত দরকার কি? বেড়ানোটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। ঠিক কথা, মুখ্য উদ্দেশ্য বেড়ানো সে বিষয়ে দ্বি-মত নেই, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য যাতে ভেস্তে না যায় তার জন্যই নিরাপদে থাকা-খাওয়ার মত গৌণ উদ্দেশ্য সাধনের নিশ্চয় প্রয়োজন, নয় কি? কত দর্শনীয় জায়গা বাদ পড়ে যায় নিরাপদ আস্তানা না পাওয়ার জন্যে। কত উপভোগ্য দৃশ্য ফেলে যেতে হয় অভ্যস্ত ভোজনের অভাবে।

বিদেশ-বিভুঁয়ে রিকশাওলা টাঙাওলারা ভ্রমণের গাইড হিসেবে মন্দ নয়। এই সব অশিক্ষিত লোকগুলো কোন রেফারেন্সের ধার না ধারলেও, সাল-সংবত মনে না রাখলেও দীর্ঘ কাল ধরে যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে অভ্যাসে যা বলে তার মূল্য খুব কম নয়। যাত্রীরা কাঠামো পেয়ে যাবে, এবার তাতে রং চড়াক, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করুক। আমাদের টাঙাওলা যেতে যেতে বলল—আগে কি জগদীশ মন্দিরে পূজো দেবেন বাবুজি?

এরা জানে বেশীভাগ যাত্রীরাই ভগবদ্‌বিশ্বাসী, যে কোন ধর্মেরই হোক না। তাই এরা যাত্রীদের এই বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে এবং প্রাধান্য দেয়।

বললাম—চল।

টাঙাওলা ঘোড়াকে জোরে ছোটাল—চল্ মোতি, জোর চল্ রে!

রাজপুতানার সব ঘোড়ার নামই মোতি নাকি? আলোয়ারের টাঙার ঘোড়ার নাম ছিল মোতি, চিতোরগড়ে ঘোড়াটাকে 'মোতি' ডাকতে শুনেছি আবার এখানেও ঘোড়াটাকে বলছে মোতি! বললাম—তোমাদের সব ঘোড়ার নামই মোতি নাকি?

টাঙাওলা হেসে বলল—নামটা ভাল আছে! এটা নতুন ঘোড়া। আগের ঘোড়ার নাম ছিল চেটক।

—চেটক? রুমী জিজ্ঞাসা করল।

—চৈতক। রাণা প্রতাপের ঘোড়া ছিল। চৈতককে বলছে চেটক। এ অঞ্চলে চেটক নামের বড় সম্মান। যে কোন ঘোড়ার মালিক, যত দুর্বলই হোক না, নিজেকে রাণা প্রতাপ আর ঘোড়াকে মনে করে চেটক, সে যত রোগা ঘোড়া হোক না কেন।

পৌঁছে গেলাম জগদীশ মন্দিরে। বিষ্ণু মন্দির। ১৬৫১ সালে মহারাণা জগৎসিং-এর তৈরী। জগৎসিং নামে একাধিক রাজা ছিলেন। এ মন্দির প্রথম জগৎসিং-এর। মন্দিরে ঢোকবার মুখে একটা ছোট ছেলে এল। হিন্দীতে বলল—আমি ইস্কুলে পড়ি বাবু, গাইড হয়ে আপনাকে সব বাতলে দেব।

এদের ব্যাপার আমার জানা হয়ে গেছে। ইস্কুলে পড়ি বলা একটা কৌশল। কেউ এদের কথা বিশ্বাস করে বিদ্যের ওপর আস্থা রেখে, কেউ বা দয়াপরবশ হয়ে গাইডত্ব গ্রহণ করে পয়সা দেয়। ইস্কুলে অবশ্য কেউ কেউ পড়ে। ছেলেটা পিছু নিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগল—ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, যাতে বলতে বলবেন বলব।

বটে! বললাম—বেশ, বাংলায় বল।

ছেলেটা ফাঁপরে পড়ল। আমতা আমতা করতে লাগল।

বললাম—বাংলামে বোল।

বাংলায় বলল না। যাকগে, তাকে আট আনা পয়সা দিয়ে বিদায় করলাম।

জগদীশ মন্দির দেখার পর সিটি প্যালেস দেখার পালা। রাজস্থানের বিশালতম প্রাসাদ উদয়পুরের প্রাসাদ। পিচোলা হ্রদের তীরে গ্রানাইট ও মার্বল পাথরের অপূর্ব মহারাণার প্রাসাদ। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে পিচোলা হ্রদ সমেত সমস্ত উদয়পুরকে ছবির মত দেখা যায়। চিতোরগড় থেকে মীরাবাইয়ের গিরিধারী গোবিন্দকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। প্রাসাদে দর্শকদের জন্যে রাখা আছে কষ্টি-পাথরের মূর্তিটি, আর প্রাসাদের যে অংশে এখনও রাজ-পরিবার বাস করছেন সেখানে মন্দিরে রাখা আছে সোনার গোবিন্দ। রাজমাতা নিত্য পূজো করেন। গোবিন্দকে পূজো করতে করতে তাঁর কি মনে হয়? মনে হয় না কি তিনি সাধিকা মীরাবাইয়ের বধূমাতা, মীরাবাই তাঁর শ্বশ্রূমাতা, কল্পনায় নয়, বাস্তবেই? দু'চোখ দিয়ে নিশ্চয়ই নামে বিগলিত ধারা, মনটি কি তখন থাকে ঐ উদয়পুরের প্রাসাদে? সমস্ত সত্তা কি রণছোড়জীকে পাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে না? অন্তর কি গেয়ে ওঠে না—

"হরি মৈতো প্রেম দিওয়ানী,
মেরা দরদ না জানে কৈ......"?

প্রাসাদের ভেতর চিত্রশালাটি চমৎকার। রাণা প্রতাপের পর্বতে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ, চিতোরগড়কে উদ্ধার না করা পর্যন্ত পাতার পাত্রে আহার ও তৃণশয্যায় শয়ন, হলদিঘাটে আকবরের ফৌজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর তৈল-চিত্র আছে।

প্রাসাদ থেকে একটি মনোরম দৃশ্য দেখতে পেলাম। পাহাড়ের পাদদেশে পিচোলা হ্রদের প্রায় মধ্যিখানে জল ছুঁয়ে আছে জগনিবাস প্রাসাদ। যেন ক্যালেণ্ডারের রঙিন ছবি। ১৭৫৭ সালে দ্বিতীয় জগৎসিং-এর তৈরী প্রাসাদ। জগৎসিং-এর আমলের প্রাসাদে এখন হোটেল হয়েছে টুরিস্টদের জন্যে। এখানে বহু কক্ষ, স্নানের সরোবর, ফোয়ারা, বাগানের বিচিত্র সমাবেশ। বড় মহল, খাসমহল, দিলারাম, চন্দ্রপ্রতাপ ও সজ্জন-নিবাস এই দ্বীপ-প্রাসাদকে অতুলনীয় করেছে।

পিচোলা হ্রদের ডান দিকের প্রায় শেষ দিকে আর একটা দ্বীপ-প্রাসাদ আছে, তার নাম জগমন্দির। এ প্রাসাদ জগনিবাস প্রাসাদের থেকেও পুরোনো। শাহজাদা খুরমের স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। খুরম তখনও শাহজাহান নাম নেন নি। পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এখানে অনেকদিন লুকিয়ে ছিলেন।

টগবগ টগবগ করে মোতি সব জায়গায় নিয়ে গেল। নিয়ে গেল ফতে সাগরে, নিয়ে গেল প্রতাপ উদ্যানে, নিয়ে গেল সহেলিয়োঁ-কা-বাড়ি। ফতে সিং-এর করা ফতে সাগর—দেড় মাইল লম্বা এক মাইল চওড়া। মোটর বোটে জলবিহারের ব্যবস্থা আছে। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের মিলন ঘটিয়েছেন রাজস্থান সরকার। ফতে সাগরের মধ্যিখানে এক অতি সুন্দর বাগান আর রেস্টুরেণ্ট করে দেওয়া হয়েছে। নাম নেহরুবাগ। ফতে সাগরের ধারেই উঠে গেছে একটা নাতি উচ্চ পাহাড়। পাদদেশে সুন্দর বাগান। চূড়োয় আছে কালো রংয়ের চৈতকের পিঠে যোদ্ধৃবেশে দৃপ্ত ভঙ্গিতে অতিকায় রাণা প্রতাপের মূর্তি। এটি প্রতাপ পার্ক। চৈতকের মৃত্যু হয়েছিল হলদিঘাটে, উদয়পুর থেকে প্রায় ৪১ মাইল দূরে, কিন্তু তার সমাধি নাকি এইটি, মোতির মালিক এই কথা আমাদের জানিয়ে মোতিকে দু'বার চাপড় মেরে আদর করে নিল। এর চূড়ো থেকে বাঁদিকে বহু দূরে পিচোলা হ্রদকে দেখা যায়। পিচোলা আর ফতে সাগর একটি সরু খাল দিয়ে যোগ করা।

ফতে সাগর থেকে আমরা যখন সহেলিয়োঁ-কা-বাড়িতে নেমে এলাম বেলা তখন পড়ে এসেছে। এ এক বিচিত্র প্রাসাদ; শুধু ফোয়ারা আর ফোয়ারা! বিচিত্র সব ফোয়ারা! কোথাও গম্বুজের কার্নিস বেয়ে ঝরঝর করে পড়ছে জলের ধারা, কোথাও পাথরের হাতীরা শুঁড় বেঁকিয়ে প্রচণ্ড বেগে জল উৎক্ষেপণ করছে, কোথাও ওপর থেকে জলধারা যা একমুখী হয়ে পড়তে যাচ্ছিল

তাকে বাত-পতাকার মত অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান কষ্টি-পাথরের কপোত চারদিকে সৃষ্টি করছে জলকণা। ইংরেজীতে এর নাম দেখেছিলাম প্যালেস অব ফাউন্টেন্‌স। ফোয়ারার প্রাসাদ তো বটেই কিন্তু এ নামে যেন মন ভরে না। তার থেকে সিং-রাজাদের দেওয়া নাম সহেলিয়োঁ-কা-বাড়ি অনেক মধুর। সখীদের আলয় তো এই রকমই হওয়া উচিত। প্রাসাদটার চারদিক ঘিরে আছে বাগান। বাগানের মধ্যে এক জায়গায় দেখলাম পুষ্করিণীর মত। তার চারধার গোল করে বাঁধান, তাতে অসংখ্য ছিদ্র। সেই সরু সরু ছিদ্রপথে তোড়ে জল বেরিয়ে সৃষ্টি করছে ফোয়ারা। রুমী কখন এসে তার পাশে বসে পড়ে শীকর উপভোগ করছে, দেখতে পাই নি। আমাকে দেখে বলল— বেলা তো পড়ে এল, কোথাও এখন আর গিয়ে লাভ নেই। একটু এখানে বসো।

বসলাম। রুমী বলল—সখীদের থাকবার জন্যে এমন জায়গা করেছিল কে? কী স্বপ্নময় জায়গা!

বললাম—মহারাণা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিং। যে সখীদের জন্যে এটি করা হয়েছিল সেই সখীদের তিনি পেয়েছিলেন মুফৎসে।

—তার মানে?

মহারাণার সঙ্গে তখন দিল্লীর বাদশার খুব দোস্তি। দোস্তির নিদর্শনস্বরূপ তিনি মহারাণাকে একগাদা কুমারী যুবতী উপহার দেন।

রুমী বিস্ফারিত চোখে বলল—কত জন?

বললাম—একগাদা।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে যখন রাত্রে বিশ্রাম নিই, নিশ্চিন্ত বিশ্রাম। দেহ শ্রান্ত হয়ে পড়ে পড়ুক, মন যদি ডগমগ থাকে তো দেহের ক্লান্তি মিটতে বেশী সময় লাগে না। ভ্রমণের স্বাদ এক আজব জগতের স্বাদ! একই রকম মাঠ ঘাট নদী পাহাড়, তবু মনে হয় এরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র।

পরদিন রুমী ঘুম থেকে আমায় জাগিয়ে দিয়ে বলল—আজ একলিঙ্গজী দেখতে যাবার কথা না?

তাই তো! সকাল সকাল না বেরোলে হয়তো অনেক কিছু বাদ পড়ে যেতে পারে। বললাম—তৈরি হয়ে নাও। আমিও নিচ্ছি। নাথদ্বারেও আজ যাব।

রুমী জানতে চাইল—নাথদ্বারে কি আছে?

বললাম—শ্রীনাথজী, খুব জাগ্রত ঠাকুর।

উদয়পুর থেকে নাথদ্বারে বাস যায়। বিশেষ দূর নয়, মাইল তিরিশ হবে। একলিঙ্গজীর মন্দির পড়ে মাঝ-পথে। রোডওয়েব বাস। তবু একলিঙ্গর

মন্দিরের সামনে বাসকে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে, যাত্রীরা দর্শন করে আসবে। রাজপুত বংশের আদি দেবতা একলিঙ্গ মহাদেব। গোহিলোট রাজবংশের প্রথম পুরুষ বাপ্পা রাওল প্রতিষ্ঠিত মহাদেব। ৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মেবারের কুলদেবতা।

একলিঙ্গজীর মন্দিরের সামনে বাস থামার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা নেমে পড়ল। আমরাও নামলাম তাদের সঙ্গে। বাইরে থেকে আন্দাজ করা যায় না মন্দিরের ভেতরটা কত সুন্দর।

রুমী বলল—বাপ্পা রাওলকে একলিঙ্গের দেওয়ান বলা হত না?

বললাম—হ্যাঁ। হারীত নামে এক মহাযোগী বাপ্পাকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। বাপ্পাই গরু চরাতে চরাতে জঙ্গলে একলিঙ্গের সন্ধান পান।

রুমী বলল—প্রথম থেকে বল।

বাপ্পা রাওল বিখ্যাত শিলাদিত্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নাগাদিত্য ভিলদের হাতে নিহত হলে পুরোহিতরা তিন বছরের বাপ্পাকে নিয়ে পালিয়ে এসে ত্রিকূট পাহাড়ে আশ্রয় নেন। বাপ্পা সেখানেই বড় হতে থাকেন। ব্রাহ্মণদের গরু চরাতে চরাতে একদিন তিনি গভীর বনে ঢুকে পড়েন এবং সেখানে একলিঙ্গজীর সন্ধান পান। এই সময় একটা ব্যাপার হল। সে ব্যাপারটি ভারি মজার। শারদীয় ঝুলন উৎসব রাজপুতদের একটি বিশেষ উৎসব। আবালবৃদ্ধ এই উৎসবে মেতে ওঠে। বাপ্পা রাওল তখন ছোট ছেলে। এ জায়গা তখন কোন একজন শোলাঙ্কী রাজার রাজ্য ছিল। তাঁর বালিকা মেয়ে সখীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে বনের মধ্যে চলে এল। গাছের ডালে দোলনা ঝোলাতে হবে। দড়ি কোথায় পায়? কাছে বাপ্পাকে দেখতে পেয়ে বলল, দড়ি দাও। বাপ্পা কৌতুক করে বললেন, আগে আমাকে বিয়ে কর তবে দড়ি দেব। বালিকা তাতেই রাজী। সখীরা তখন বালক-বালিকা দুজনকে খেলাঘরের বিয়ে দিল। এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। শোলাঙ্কী রাজকন্যার যখন প্রকৃত বিয়ের বয়স হল, গণৎকার হাত দেখে বলল, এ কন্যার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। অতএব আর বিয়ে হবে না। শোলাঙ্কী রাজা তখন চারদিকে লোক পাঠালেন—খোঁজ খোঁজ কে এ কাজ করেছে। বাপ্পা রাওল তখন ব্রাহ্মণদের পোষ্য। বাল্যকালের খেলা যে এমন ঘোরালো আকার ধারণ করবে কে জানত? কাজেই সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। সেখানেই সিদ্ধপুরুষ গোরক্ষনাথ ও মহাযোগী হারীতের দর্শন পান। নানাভাবে সেবা করে হারীতকে সন্তুষ্ট করলে হারীত বাপ্পাকে 'একলিঙ্গের দেওয়ান' উপাধি দেন। তাঁর আশীর্বাদে মালবের জায়গীর পান। ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর জয় করে তিনি গোহিলোট রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে তিনি ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরাণ,

তুরাণ প্রভৃতি দেশ জয় করে, প্রত্যেক দেশের রাজকুমারীদের বিয়ে করেছিলেন। এই সব রানীর গর্ভে যত ছেলে হয়েছিল তার সংখ্যা শুনবে, কত ?

রুমী বলল—কত ?

—একশো তিরিশ। তারা এখন লোশেরা পাঠান। মানে তাদের বংশ এখন লোশেরা পাঠান। ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে একশো বছর বয়সে বাপ্পা রাওল মারা যান।

রুমী চোখ বড় বড় করে বলল—ওঁর সব ছেলেরাই মুসলমান রানীর গর্ভে হয়েছিল ?

বললাম—না, হিন্দু রানীও ছিলেন অনেক। তাঁদের ৯৮টি ছেলে হয়েছিল। তাঁরা সকলে অগ্নি উপাসক সূর্যবংশীয়।

একলিঙ্গ দর্শন করে যাত্রীরা ফিরে এলে বাস ছেড়ে দিল নাথদ্বারের পথে। এখান থেকে মাইল ১৬।

যেতে যেতে একজন যাত্রী বলল—এখন তো মন্দির খোলা পাবেন না। সকালবেলা খুলে এগারোটায় বন্ধ হয়, আবার খোলে বেলা তিনটায়। হিসেব করে দেখলাম এগারোটার আগে পৌঁছতে পারব না। হলও তাই। এগারোটা পার করে দিয়ে বাস নাথদ্বারে পৌঁছল।

কণ্ডাক্টার বলল—নাথদোয়ারা আ গিয়া।

বললাম—বাস যাবে কতদূর ?

বলল—কাঁকরোলি।

বেশ কথা। আমাদের প্রোগ্রামে কাঁকরোলি ছিল না। অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম। সেখানে আছে বিষ্ণু-মন্দির এবং জৈন মন্দির। আর আছে রাজসিংহের তৈরী রাজসমন্দ হ্রদ, রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ।

নাথদ্বার থেকে কাঁকরোলি মাত্র ১০ মাইল। এখানকার বৈষ্ণব মন্দির দ্বারকাধীশের মন্দির। নাথদ্বারের মন্দিরের অনুরূপ।

হাতে এখন অনেকখানি সময়। কাঁকরোলি থেকে সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই রাজসমন্দ হ্রদ। এখান থেকে রাজস্থানের বহু জায়গায় সেচের জল যায়। ভারতের এটিই একমাত্র স্থান যার পাড়ে মার্বেল পাথরের দীর্ঘতম সারিতে সংস্কৃত অক্ষর খোদাই করে লেখা।

রাজসমন্দ বাঁধ দেখে বিষ্ণু-মন্দিরে এলাম। বিরাট মন্দির। দেবতার ভোগ-রান্নার জন্যে কাঠ এনে রাখা আছে উঠোনে। মন্দির-চাতালে ওঠবার আগে রুমী দেখি একখণ্ড কাঠ হাতে করে নিয়ে এল। বললাম—এটা কি ব্যাপার ?

রুমী বলল—ভোগের জ্বালানী কাঠ। বয়ে নিয়ে গেলে পুণ্য হয়। দেখছো না কত লোক নিয়ে যাচ্ছে ?

সত্যি তো! অনেক বৃদ্ধাও কাঠ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লক্‌ড়ি হাতে আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন বুড়ী বলল—তুম্‌ভী এক লক্‌ড়ি উঠা লেও।

বিষ্ণু দর্শন সেরে আমরা মন্দিরটা একটু ঘুরে দেখতে লাগলাম। মন্দিরের পেছনে একটা সানবাঁধানো বিরাট দীঘি। মন্দিরেরই দীঘি। অসংখ্য মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। মাছকে খেতে দেবার জন্যে ছোট ছোট ঠোঙায় দানা বিক্রি হচ্ছে। লোকে জলে দানা ফেলছে আর মাছেরা জল তোলপাড় করে সেই দানা খেয়ে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ সব। কিন্তু ধরা বারণ। জয়পুরে ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছিলেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ দেখে রসনা চঞ্চল হবে কিন্তু ধরা বারণ।

যথা সময়ে কাঁকরোলি থেকে বাসে নাথদ্বারে ফিরে এলাম।

কাঁকরোলি আর নাথদ্বারের মাঝখানে একটু পশ্চিম দিকে গেলে হলদিঘাট। এই সেই হলদিঘাট যেখানে রাজস্থানের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত গেল। ১৫৭৬ সালে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে বীর রাণা প্রতাপসিং সমর-ক্ষেত্রে শয়ন করেছেন। তাঁর প্রভুভক্ত ঘোড়া চৈতক প্রভুর পাশে অপেক্ষা করে করেই অন্তিমকালে ঢলে পড়ল। সে যে জায়গায় মরেছিল সেখানটা বিশেষভাবে চিহ্নিত আছে। উদয়পুর থেকে ৪১ মাইল।

চৈতকের জন্যেই রাজস্থানে পোষা ঘোড়াদের খুব খাতির।

নাথদ্বারে ফেরার একটু পরেই মন্দির খুলল। দর্শন করলাম শ্রীনাথ বিষ্ণুকে। ভারতবর্ষে এমন প্রাচীন বিগ্রহ কমই আছে। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে বল্লভাচার্য এ মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

বল্লভাচার্য এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ছিলেন। প্রথমে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন পরে গৃহস্থ হয়েছিলেন। তাঁর মতে উপাসনার জন্যে উপোষ, কায়ক্লেশ বা বিলাস বর্জনের দরকার নেই। প্রসিদ্ধি আছে বৃন্দাবনে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন পেয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেব যখন মথুরা, বৃন্দাবনে সমস্ত দেব-বিগ্রহ কলুষিত করে দিচ্ছিল সেই সময়ে মেবারের রাজা রাজসিংহ শ্রীনাথজীকে নিয়ে আসেন।

বিকেল শেষ হতে চলল। শ্রীনাথজীর দর্শন সেরে বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে চলেছি। বাস স্ট্যাণ্ডে যেতে একটু হাঁটতে হয়। পথের ধারে ভুট্টা বিক্রি হচ্ছে। রাজস্থানী গ্রাম্য মেয়েরা ভুট্টা বিক্রি করছে। রাজস্থানে এসেছি—অথচ ভুট্টা খাই নি। লোকে বলবে কি! ভুট্টা পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদেরও দিল। কলকাতার থেকে দাম কম নয়। কিন্তু নুন লেবু কিছু মাখল না। এখানকার লোক নুন লেবু দিয়ে ভুট্টা খায় না। কাজেই সে বন্দোবস্ত ভুট্টা-ওয়ালীদের কাছে নেই। পাশের দোকান থেকে খানিকটা নুন আর একটা লেবু কিনে এনে বললাম—আমাদের ভুট্টায় মাখিয়ে দাও। মাখিয়ে দিল।

আমরা পরিতোষের সঙ্গে খাচ্ছি দেখে ঐ দেশীয় একজন খদ্দের বলল, আমারটাতেও লাগিয়ে দাও। কিন্তু বেচারা নুন লেবু মাখা ভুট্টা মুখে দিয়ে ফেলে দিল। বলল, তোমরা খাও কি করে?

এই হয়। আমরা উর্বর অঞ্চলের লোকেরা মশলাপাতি মিশিয়ে তারিয়ে খেতে ভালবাসি। কিন্তু যারা পাহাড়ী দেশের বা রাজস্থানের মত রুক্ষ অঞ্চলের লোক তাদের খাওয়াতে এত বাহুল্য থাকে না।

নাথদ্বার থেকে উদয়পুরে ফিরে যখন এলাম, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেওয়ালীর সময়। সারা উদয়পুর আলোয় ঝলমল করছে। ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে আলোক-সজ্জা। খুশীর জোয়ার এসেছে সকলের মধ্যে। রাজস্থানীদের একটি বড় উৎসব দেওয়ালী। যেখানে বাঙালী বেশী আছে সেখানে দুর্গা পূজো হয় ঘটা করে। অন্যথায় তিনি পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু কালী পূজোর দেওয়ালী ভারতের সর্বত্র মহা আড়ম্বরে পালন করা হয়। রাজস্থানে, জয়পুরে ও উদয়পুরেই দেওয়ালীর রোশনাই বেশী।

উদয়পুরের পরে আমাদের যোধপুর যাবার পালা। উদয়পুর তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। ভোর হচ্ছে সবে। আমাদের নিয়ে ট্রেন ছাড়ল।

যোধপুর! উদয়পুর থেকে ভোর ছ'টায় গাড়িতে উঠেছিলাম। যোধপুরে এসে পৌঁছলাম সন্ধ্যের দিকে। মাঝে মাড়বার জংশনে একবার গাড়ি বদল করেছিলাম। যোধপুরে আসার পথে একটা ব্যাপারে খুব মজা পেলাম। লুনি জংশন আসছে, যাত্রীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সকলে বাটি, টিফিন-কেরিয়ার ইত্যাদি হাতের কাছে ঠিক রাখতে লাগল। কি ব্যাপার দেখা যাক। লুনি জংশন এসে গেল। ও হরি! রসগোল্লা কেনবার জন্যে এত ঘটা! রসগোল্লা কেনার ধুম পড়ে গেল। মিষ্টিগুলোর চেহারা বেশ ভালই! বেশ ভাল বললে সব বলা হল না, বলতে হচ্ছে বিরাট আকার। তিনটে রসগোল্লায় এক কিলো! রাজস্থানীরা মাথায় বিশ গজি থানের পাগড়ি বাঁধে বলেই বোধ হয় এই পেল্লায় রসগোল্লা বানাবার প্রেরণা পায়! দামটাও ন্যায্য।

রসগোল্লার জন্ম কোন্ দেশে জানি না, তবে রাজস্থানে হবে না বলেই মনে হয়, কারণ যে সব জায়গায় প্রচুর গবাদি পশু পালনের সুবিধা আছে দুধের রকমারি খাবার তৈরী সম্ভব সেখানেই। কাজেই ভারতের পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব এই শুভ্র কন্দুকদের এই রুক্ষ পশ্চিমাঞ্চলে দেখে ভালই লাগল। ওজন দরে বিক্রি হচ্ছে রসগোল্লা। রুমী মহা আনন্দে একটা পাত্র বের করে খানিকটা কিনে ফেলল।

বললাম—অত কি হবে?

বলল—খাওয়া হবে।

—অত ?

—হ্যাঁ! কতদিন রসগোল্লা খাই নি। কেবল রুক্ষ দেশে ঘুরছি।

যোধপুর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মিলিটারি হেড কোয়ার্টার। পশ্চিম সীমান্তের সিংহদ্বার। এখান থেকে যাওয়া যাবে বিকানীর, জয়শলমীর, বোরমের। রাজস্থানের দুই-তৃতীয়াংশ মরুভূমি! চিতোরগড়, উদয়পুর রুক্ষ হলেও যোধপুর থেকেই ঠিক মরুভূমিকে বোঝা যায়। সামন্ত রাজাদের সময়ে যোধপুর সব থেকে বড় স্টেট ছিল। সমগ্র মাড়োয়ারের রাজধানী ছিল। ১৪৯৮ সালে রাঠোর যোধা রাও যোধপুরের পত্তন করেন। মরুভূমির বুকে এমন জমজমাট শহর বিস্ময় জাগায়। অবশ্য ভারতের প্রতিরক্ষার খাতিরে এ শহর হু-হু করে উন্নতি হয়েছে। যোধা রাওয়ের সময়েও অবশ্য যোধপুর ছিল রাজপুত সেনা-বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র। প্রাচীন শহর ছিল ছ'মাইল লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। নগরের ছিল পাঁচটি তোরণ—নাগরি, যোজাতি, মেরতি, ঝালরি ও সিবাঞ্চি। যোধপুরের আকর্ষণ হল যশোবন্ত থারা ও যোধপুর কেল্লা। চার শ' ফুট ওপরে একটি পাহাড় জুড়ে এই কেল্লা। যেন পাহাড়টা ঐ কেল্লার মাপে তৈরি হয়েছিল। সমতল থেকে সর্পিল ভঙ্গিতে কেল্লা পর্যন্ত রাস্তা উঠে গেছে। কেল্লার ভেতরে আছে প্রাসাদ। এখনও বহুলাংশে অটুট। দেওয়ালে ও জানলায় খোদাই করা নকশা দেখে মনে হয় না ওরা পাথরের। যেন আখরোট কাঠে কাশ্মীরি নকশা।

কেল্লার খুব কাছেই আর একটা পাহাড়ের ওপরে যশোবন্ত থারা—যশোবন্ত রাওয়ের সমাধি-মন্দির। যশোবন্ত রাওয়ের নামে হলেও এখানে আরও বিয়াল্লিশ জন রাজপুত রাজার সমাধি আছে। তিন দিকে দেওয়াল জোড়া তৈলচিত্রগুলো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় যশোবন্ত থারা। শ্বেত-পাথরের দেওয়াল মাঝে মাঝে এত পাতলা যে ওপারের রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। আগ্রায় আছে তাজমহল, যমুনার তীরে শ্বেত-মর্মরের গান। কিন্তু যশোবন্ত থারার নির্মাতার কৃতিত্ব তাজমহলের নির্মাতার থেকে অনেক বেশী। মরুর বুকে সৃষ্টি করেছে রসাল! তাজমহল সৃষ্টি করার পর শাহজাহানের অহংকার হয়েছিল—তিনি ছাড়া কি আর কেউ এমন স্মৃতি রেখে যাওয়ার যোগ্য? তিনি মোগল সম্রাট, প্রেমিক; ভাবুক। তিনি এমন কীর্তি রেখে যাবেনই তো! হায়! তিনি যদি যশোবন্ত থারার কথা জানতেন। রাজপুত কাব্যহীন, সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। পাশে নেই যমুনা, আছে কেবল রুক্ষ পাহাড়। সেখানে রেখে গেল এমন নিখুঁত শ্বেত পাথরের শিল্প-সাক্ষ্য? কিন্তু এমন যে শ্বেত-পাথর তাকে কি কেবল সমাধি নির্মাণেই ব্যবহার করা হবে? এই জন্যেই কি এর সার্থকতা? কে যেন বলে উঠল, কে বললে?

গিয়ে দেখে এস না আবু পাহাড়ের দিলওয়ারা দেবদেউল; দেখবে শ্বেত পাথর কতখানি সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

যোধপুরে আমরা অটোরিকশা-ওয়ালাকে ভাল পেয়েছিলাম। সাদাসিধে লোক। সে বললে, যোধপুরের সব দেখিয়ে দেব, খুশী হলে তবেই পয়সা দেবেন।

তা যত্ন করে সে সব দেখাল। যোধপুর ছাড়বার আগের দিন গেলাম মান্দোর। মারবাড়ের রাজধানী। যোধপুর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে। বিখ্যাত মান্দোর উদ্যান দেখতে লোক আসে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে মনোরম উদ্যান। বাগানটিকে আরও আধুনিক করে তোলা হচ্ছে। বাগানে আছে রাজাদের সমাধিভবন, মিউজিয়াম আর কিছু হরিণ। একদিকে আছে ষোলটি অতিকায় দেবতার মূর্তি। একটি পাথরের ওপর খোদাই করা অতগুলো মূর্তি। এত বিশাল বিশাল মূর্তি যে জায়গায় আছে তার চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে 'হল অব্ হিরোজ্'। মান্দোরে পৌঁছোবার আগে বাল-সমন্দ হ্রদ। রাজস্থানের প্রত্যেকটা হ্রদই যোজনব্যাপী। এদের সেইজন্যে সমন্দ (সমুদ্র?) বলে বোধহয়। বাল-সমন্দের তীরে সুন্দর সাজান বাগান ও মনোরম প্রাসাদ।

বিকেলে গেলাম কৈলানা হ্রদে। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে। আমাদের নিয়ে অটোরিক্শা ছুটল। যাবার সময়ে একটা লেভেল ক্রসিং পার হলাম। মিটার গেজ। রুমীকে বললাম—এ লাইন মরুভূমির ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে জয়শলমীর। এক রোমাঞ্চময় ছোট্ট মরু শহর। কাল আমরা এই পথে পাড়ি দেব।

রুমী বললে—আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

নির্জন পরিবেশে আপনমনে কৈলানা হ্রদের জল বয়ে যাচ্ছে। ওপারে ছোট ছোট পাহাড় জেগে আছে। পাহাড়ের ওপর দূরে একটা পরিত্যক্ত সৌধ। বোধহয় কোন রাজপুত রাজার শিকারমহল। লোকালয়ের নামগন্ধ নেই। এমন নির্জনতায় আমাদের অটোরিকশার গর্জন বড় তীব্র ও খাপছাড়া মনে হল। হ্রদের জলে মাছ আছে অনেক। যোধপুর শহরে দেখেছি উমেদ সিংয়ের উমেদ ভবন—রাজপ্রাসাদ। দূর থেকে অনেকটা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মত দেখতে। সেখানে থাকেন বর্তমান রাজা। তিনি এখনও মাঝে মাঝে এখানে আসেন শিকার খেলতে। কৈলানার জঙ্গলে আছে অসংখ্য হনুমান। আমার ধারণা ছিল এরা নদীমাতৃক আর্দ্র অঞ্চলের জীব। কিন্তু মরু অঞ্চলেও এরা তো দেখছি পালে পালে বাস করছে। আমাদের দেখে এরা নির্ভয়ে এগিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল—কিছু খাবার দিতে হবে আর কি!

সেদিন কৈলানা হ্রদের ধারে সূর্যাস্ত দেখলাম।

যোধপুর থেকে জয়শলমীরের গাড়ি ছাড়ে রাত আটটায়। যোধপুর স্টেশনটা বড়। প্লাটফর্ম দীর্ঘ। প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে কতকগুলো অন্ধকার বগী লেগে আছে, এখনও ইঞ্জিন লাগে নি। ওরাই যাবে জয়শলমীর। রেল কুলিদের সব নখদর্পণে। মালপত্র মাথায় নিয়ে কুলি এগোল সেইদিকে। আমরা তাকে অনুসরণ করলাম। গাড়ি ছাড়তে এখনও অনেক দেরি। সারাদিন একটি গাড়িই জয়শলমীরে যায় বলে ভিড় হয় খুব। সেইজন্যে চলে এসেছি একটু আগেভাগে। আগে যোধপুর থেকে পোকারান পর্যন্ত ট্রেন যেত। যোধপুর থেকে পোকারান ১০০ মাইল। পোকারান থেকে বাসে ৭০ মাইল জয়শলমীর। কিন্তু এখন অনেক সুবিধে। গাড়ি বদলের ঝঞ্ঝাট নেই। মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে ট্রেন লাইন সোজা জয়শলমীর চলে গেছে।

প্লাটফর্মের যেটুকু আলো জাঁনলা দিয়ে কামরায় আসছিল তাতেই দেখে দেখে বাংকে মালপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে কুলি বলল—কোন ভয় নেই, একটু পরে ইঞ্জিন লাগলেই আলো জ্বলে উঠবে।

আমাদের আগেই অনেকে জায়গা করে বসে আছে দেখলাম। আরও লোক আসছে। রাতের গাড়ি। রিজার্ভেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই শোবার জায়গা করে নেবার জন্যে অনেকে বেশ আগে ভাগে চলে আসে। গাড়িতে ভিড় হবার আর একটা কারণ আছে, যোধপুর মিলিটারি হেড কোয়ার্টার। এখান থেকে পশ্চিম সীমান্তে হরদম মিলিটারি যায়। ট্রেনের অধিকাংশ কামরা সংরক্ষিত থাকে তাদের জন্যে। তাই সামান্য দু' কামরা থাকে সাধারণের জন্যে। ভিড় হবেই তো। ১৯৭১ সাল। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান লোপ পেয়ে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে জন্ম নিচ্ছে জনগণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ। দুই পাকিস্তানে যুদ্ধ লেগেছে। তার ঢেউ ভারতে এসেও ধাক্কা দিয়েছে। আশঙ্কা পশ্চিম সীমান্তের দিকে। তাই সেদিক রক্ষায় ভারতীয় ফৌজ তৎপর। গাড়িতে যত যাত্রী সকলেই কিন্তু জয়শলমীর যাবে না। মাঝখানে অনেক ছোট ছোট স্টেশন আছে, সেখানে তারা নামবে। জয়শলমীরে যাবে তারা যারা সেখানে পুরুষানুক্রমে বাস করছে অথবা সেখানে সরকারী কাজে রয়েছে। আর যাবে আমাদের মত কোন ভ্রমণবিলাসী। তাও রিপোর্টে প্রকাশ জয়শলমীরে পর্যটকরা কমই আসে, মরু শহর দেখতে তারা সাধারণতঃ বিকানীরেই যায়।

রুমীকে বললাম—একটু বস, প্লাটফর্মে গরম দুধ বিক্রি হচ্ছে দেখে এসেছি। দু'গেলাস নিয়ে আসি।

দুধ নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরছিলাম। একটি কামরার সামনে এসে পা থেমে গেল। এমন করুণ দৃশ্য আমার অভিজ্ঞতায় প্রথম। একদল মিলিটারি যাচ্ছেন, তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা আড়ম্বরহীন বিদায় জানাতে এসেছেন। একপাশে দেখলাম একজন অল্পবয়স্কা মহিলা দুটি ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বিদায় জানাতে এসেছেন। বাচ্চাদের কিভাবে রাখবে, খাওয়াবে ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী-সৈন্যটি বৌটিকে কত কি বলে যাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে বাচ্চা দুটিকে আদর করছেন। স্ত্রীকে অনেক কিছু পরামর্শ, উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। এত আবেগের সঙ্গে সৈন্যটি বলে যাচ্ছেন যেন গ্রামোফোন। এঁরা হয় তো বুঝছেন পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে ফেরার সুযোগ আর পাবেন না। আর হয়তো কোনদিন এই ফুটফুটে লালদের দেখবেন না। জন্মের মত হয়তো প্রিয়তমার সঙ্গে কথা শেষ। কিন্তু তাঁর তো অনেক কাজ বাকী রয়ে গেল! তাঁকে নির্ভর করেই তো সংসার গড়ে উঠেছিল। তাই বোধ হয় নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই স্ত্রীকে অমন করে বোঝাচ্ছেন, বাচ্চাদের অত আদর করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধা, কোন কথা বলছেন না, কেবল আঁচলে চোখ মুছছেন। বোধহয় মা।

দুধ নিয়ে যখন রুমীর কাছে এলাম আমার হাত থেকে দুধের গেলাস নিয়ে সে বললে—ইস্! ঠাণ্ডা দুধ বিক্রি হচ্ছিল? এত দেরি করলে কেন?

সব বললাম। রুমী সব শুনে ছলছল চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে দুধের গ্লাস নামিয়ে রাখল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলল—কিছু ভাল লাগছে না!

আমাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। কখন গাড়িতে ইঞ্জিন লেগেছে, আলো জ্বলেছে খেয়াল করি নি। খেয়াল হল যখন হুইসিল দিল, গাড়ি ছাড়ল। কিন্তু মনের ভার তখনও সরে যায় নি। তারপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল সকাল হয়ে গেছে। রুমী আমার আগেই জেগেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই জয়শলমীর পৌঁছে যাব। দু'ধারে ধু-ধু করছে কেবল বালি আর বালি, কোথাও সমতল কোথাও স্তূপ। এই স্তূপ মাঝে মাঝে বিরাট আকার ধারণ করছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল বালিয়াড়ি। তার মাঝে জায়গায় জায়গায় কাঁটা গাছ। রেতিস্থান প্রকৃতপক্ষে এইই। বালিকে রেতি বলে। গাড়িতে আসতে আসতে এক জনের কাছে কথাটা শিখেছি। মনে হয় রেতিস্থান থেকেই রাজস্থান কথাটার উৎপত্তি। মরুভূমিতে একমাত্র সম্বল উট। উটের প্রিয় খাদ্য কাঁটাগাছ। ঝোপের আকারে কাঁটাগাছ দিগন্তপ্রসারী মরুর বুকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। মুগ্ধ হয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলাম। ট্রেন চলেছে মধ্যম লয়ে। মরুভূমির যত ভেতরে যাচ্ছি দেখছি

মেটে সবুজ কাঁটাগাছ সাদা রং ধারণ করছে। নিরস জলহীন জায়গায় বোধ হয় ক্লোরোফিলের অভাবে গাছের রং হয়ে গেছে দুধের মত সাদা।

জয়শলমীরে নেমে কালেকটার সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। কালেকটার সাহেব জয়শলমীরের সব কিছু। তিনি অনুমতি দিলে তবেই পর্যটকরা এখানে থাকতে পারবে। একটি বিশেষ অবস্থার জন্যে এমন ব্যবস্থা। জয়শলমীর সীমান্তনগর, তাই এমন ব্যবস্থা।

কালেকটার সাহেব আমায় বললেন—এখন এখানে সরকারী কাজ ছাড়া কেউ আসে না। আপনারা বেড়াতে এসেছেন, বলেন কি?

বললাম—বেড়াতেই এসেছি।

কালেকটার সাহেব বাঙালী নন। কোন্ প্রদেশের লোক বুঝতে পারছি না। কথাবার্তায় আন্তরিকতা আছে। আর চেহারাটিও সুন্দর।

তিনি বললেন—এখানে দর্শনীয় তেমন কিছু নেই। কোন যানবাহন নেই। আপনাদের পায়ে হেঁটে ঘুরতে হবে।

বললাম—জানি। জয়শলমীর দেখব বলেই শুধু জয়শলমীরে এসেছি।

কালেকটার সাহেব বললেন—এখানে নামার পরে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা হল?

নতুন অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

ট্রেন থেকে নেমে দেখলাম প্রায় জনমানবশূন্য স্টেশন। একটা কুলি কেবল নির্লিপ্তভাবে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে স্টেশনে বসে আছে। এখানেই গাড়ি শেষ। কাজেই ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ঐ কুলিটাকে ডেকেই মালপত্র নামালাম। বললাম—একটা গাড়ি বোলাও। শহরে যাব।

কুলি বলল—গাড়ি নহি মিলেগী।

বললাম—তাহলে যাব কি করে?

—পয়দালমে।

—শহর কত দূরে?

—আড়াই কিলোমিটার।

মুশকিল তো! দেড় মাইলের ওপর রাস্তা। বাক্স-বিছানা নিয়ে কি হাঁটা যায়! একটু আগেও ট্রেনে বসে যে স্বপ্ন দেখছিলাম এখন বাস্তবতার আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

কি করা যায় ভাবছি। এমন সময়ে একটা ছেলে এসে বলল—মাল শহরে যাবে বাবুজি?

হাতে চাঁদ পেলাম। ইচ্ছে করল ছেলেটাকে আদর করি। তাকে বললাম—মাল তো যাবে? কিন্তু কিভাবে যাবে?

ছেলেটা বলল—রেলামে যায়গা।

রেলা আবার কি বস্তু? খানকতক তক্তাকে জোড়া লাগিয়ে চারটে বড় বড় চাকা লাগিয়ে রেলা বা ঠেলা হয়েছে তৈরি।

ছেলেটা মালপত্র চাপিয়ে রেলা গড়গড় করে ঠেলে নিয়ে চলল, আর আমরা তার পিছু পিছু হেঁটে চললাম। চারধারে বালি আর বালি। মাঝখান দিয়ে একটা পাকা রাস্তা চলে গেছে সোজা শহরের দিকে। স্টেশন থেকে বিচিত্র আকারের জয়শলমীরের কেল্লাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। জয়শলমীর কেল্লাকে ঘিরেই শহর। এইজন্যে শহরের যে কোন জায়গা থেকে মনে হয় কেল্লা সমান দূরে।

রেলায় আমাদের মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে ছেলেটা চলেছে। আমরা পেছনে পেছনে চলেছি। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তাটা তু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকের পথটা চলে গেছে বেরমের। পোকারান থেকে যে বাস আসে সে জয়শলমীর স্টেশন ছুঁয়ে বাঁ হাতের রাস্তা ধরে চলে যায় বেরমের। কিন্তু বাসের সাধনা করা ভগীরথের তপস্যার সমান। এই তিন মাথার মোড়ে একজন জওয়ান বসে আছেন চেয়ারে। সামনে অতি সাধারণ একটা টেবিল। টেবিলের ওপর একটা খাতা মেলা। কোথা থেকে আসছি কি বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে বললেন, কালেকটারের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাছেই জানলাম জয়শলমীরে থাকবার অনুমতি কালেকটারই দেবেন।

রোদ্দুরে মরুভূমির বুকে এক ফালি পিচের রাস্তা ধরে আবার হাঁটা শুরু করলাম।

কালেকটার সাহেব রসিক লোক। সব শুনে বললেন—প্রথম অভিজ্ঞতা ভালই হয়েছে। কিন্তু মিস্টার, এখানে থাকবার মত তো কোন হোটেল নেই।

প্রমাদ গুণলাম। রাতের মরুভূমি দেখা হবে না, হয়তো ফিরেই যেতে হবে। কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার গাড়ি নেই। যে ট্রেনে আমরা এসেছি ঐটাই সন্ধ্যেবেলা আবার যোধপুর ফিরে যাবে।

হঠাৎ দেখি ভাগ্য প্রসন্ন। একটু কি ভেবে কালেকটার সাহেব একজন বেয়ারাকে ডেকে বললেন—এনাদের হোটেল মুনে নিয়ে যাও।

তারপর আমাদের বললেন—ওর সঙ্গে যান। জায়গা পেয়ে গেলেন তো ভাল। নাহলে ফিরে যাবেন আজই, কি আর করা যাবে?

ঠিকই তো, কি আর করা যাবে?

হোটেল মুন। নামটাতে খুব কাব্য মাখা। কালেকটার অফিসের কাছেই হোটেলটা। হোটেলের নামটাই সব। সেখানে থাকবার একটা ঘর পেলাম। আট ফুট বাই আট ফুট। ঘরে কোন আসবাব নেই। কেবল ছোট ছোট তু'খানা দড়ির খাট পাতা। তারা এত সরু যে কোনমতে দেহটা তার ভেতর ফেলা যায়। আর লম্বায়? পা টান টান করে শুলে পায়ের গোছা শূন্যে

ঝুলে থাকবে। যাক, মোটেই মামা ছিল না তবু একটা কানা মামা পাওয়া গেল। ধুলোয় ভর্তি ঘর। কতকাল ঝাড়ু পড়ে না কে জানে! অভ্যাসমত রুমী অপেক্ষমান ছেলেটাকে বলল—দু'বালতি জল নিয়ে আয়।

কোথায় পাবে জল? ছেলেটা বলল—সকালে 'আধ ঘণ্টার জন্যে একবার জল আসে। আবার বিকেলে এক ঘণ্টার জন্যে জল আসে।

সর্বনাশ! বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে? রেলা-চালক ছেলেটা আমাদের জিনিসপত্র নামিয়ে দিয়ে চলে যায় নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে আমাদের ব্যাপার দেখছিল। সে হোটেলের ছেলেটাকে বলল—বাবুজীরা কালেকটার সাহেবের লোক, স্নান করবার জল এনে দাও।

তাই শুনে ছেলেটা আর দেরি করল না। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জল যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন কি আর করা যায়? রুমী হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে খবরের কাগজ বার করে ঘরটাকে ঝেড়েঝুড়ে বিশ মিনিটেই বাসোপযোগী করে ফেলল। একটু পরে ছেলেটা এক বালতি জল দিযে গেল। সারারাত ট্রেনে কেটেছে। তার ওপর মরুভূমিতে এতটা পথ হেঁটে আসা। ভেতরটা জলের জন্যে টাটা করছে। বিকেলবেলা জল আসলে তখনই স্নানপর্ব সারা যাবে। এখন হাত মুখ ধোওয়া ছাড়া গতি নেই।

মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদল করে একটু তাজা লাগল। বেলা বেড়ে গেছে, বাইরে যাওয়া যাবে না। দড়ির খাটে বসে জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দিলাম। জয়শলমীরের সোনার কেল্লাকে খুব কাছে দেখা যাচ্ছে। হলুদ রংয়ের পাথর দিয়ে গড়া কেল্লা। রাজস্থানের এক এক জায়গার পাথরের রং এক এক রকম। চিতোরের পাথরের রং কালো, জয়পুরের লাল, জয়-শলমীরের হলদে। চোখের সামনে বিরাট কেল্লা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত দখল করে আছে। যেন ৭০ মিলিমিটার ফিল্ম পর্দায় দেখছি। ১১৫৬ সালে রাজা জয়শলের গড়া কেল্লা। তিনি মরুভূমির বুকে কেন এমন কেল্লা গড়তে গেলেন কে জানে! সে সময়ে কি এ জায়গা এমন ভয়ানক মরুভূমি ছিল? হয়তো তখন আরও পশ্চিম দিক ঘেঁযে মরুভূমি ছিল। যত দিন গেছে মরু বিস্তার হযেছে তত। ভূগোলবিদ্দের মতে মরু বিস্তার দিনে দিনে বেড়েই চলে। মরুভূমির বালি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে শস্য-শ্যামল প্রান্তরকে মরুপ্রান্তরে পরিণত করে। এই জন্যে মরুবিস্তারে বাধা সৃষ্টি করতে না পারলে এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। খরা অঞ্চলে বাঁচে এমন ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল ধারে ধারে রোপণ করে দিতে পারলে মরু-বিস্তারের গতি অনেক কমে যায়। সেই পদ্ধতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন কারণ রাজস্থানে মরুভূমি বেগে বিস্তার লাভ করছে।

দু' এক রাত্রি কাটাবার মত জায়গা যে আমরা পেয়েছি তাতে আমরা খুশী। হোটেল মুন নামেই হোটেল। কেবল খাবার ব্যবস্থাই আছে। তাও ঘণ্টা খানেক আগে অর্ডার দিতে হবে। আলু আর আটা ছাড়া কিছুই ওদের মজুত থাকে না। কি খাবে বলে দিলে ওরা সেই মত বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করবে। নয়তো কেবল আলুর তরকারি আর রুটি খেতে হবে। আমাদের বেলায় তাই হল। মাছ-মাংস পাওয়া যাবে না জানি, কাজেই আমিষের কথা কিছু বলি নি। কিন্তু আর যা যা বলেছিলাম কিছুই খাবারের পাতে পেলাম না। পেলাম কেবল ভাত আর আলুর একটা তরকারি।

বিকেলে সূর্যের তেজ কমে আসলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। জয়শলমীর শহরটা একটুখানি। তার মধ্যে স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতে ছোট ছোট কয়েকটা দোকান। মশলাপাতির দোকান, কাপড়ের দোকান, নাগরা জুতোর দোকান, হলদে পাথরের দোকান। দোকান বাজার সব শহরের মাঝখানে। তাদের ঘিরে আছে স্থানীয় বাসিন্দাদের বস্তি। লোকরা গরিব, এদের সঞ্চয় কিছু নেই। অথবা সঞ্চয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। সরকার থেকে প্রাইমারী ইস্কুলের ব্যবস্থা আছে। নাম মাত্র মাইনে, বছরে তিন টাকা। ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশুনো করে। বিকেলের দোকানপাট সরগরম। কেউ কেনাকাটা করছে, কেউ আড্ডা দিচ্ছে। সরু সরু রাস্তা বাজারকে কেন্দ্র করে মাকড়সার ঠ্যাংয়ের মত এদিক ওদিকে ছড়িয়ে গেছে। রাস্তার মাঝে মাঝে উট বিশ্রাম করছে। দূরের লোকরা এই সব উটে চড়ে এসেছে কেনাবেচা করতে। সন্ধ্যের আগে আবার ফিরে যাবে। বিদেশী লোকদের সহজেই চোখে পড়ে। আমাদের লোকে দেখছে। রুমীর বাঙালী ঢং-এ কাপড় পরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কেল্লার পাদদেশে দু-তিনটি খাবার দোকান দেখতে পেলাম। গরম পুরি, জিলিপি এবং দুধ, প্যাঁড়া পাওয়া যাচ্ছে। দোকানে ঢুকলাম। আরে! চমচমও তৈরি করে নাকি? বেশ করে আমরা খেলাম। দুধে চুমুক দেবার আগে মনে হল উটের দুধ নাকি! দোকানদার বলল—গরুর দুধ!

পেট ভরে খেয়ে বেরোলাম দোকান থেকে। রুমী খুব খুশী হয়েছে। আমিও কম খুশী নয়। বাজার বস্তি ছাড়িয়ে আমরা খোলা মরুভূমির ওপর এসে পড়লাম। উদ্দেশ্য আস্তানায় ফিরে যাওয়া। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু বেশী দূর যাওয়া হল না। বিকট আওয়াজ করে সাইরেন বেজে উঠল আর দেখতে দেখতে সমস্ত জয়শলমীরের আলো নিভে গেল। মরুভূমির ওপর নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। ব্ল্যাক আউট। যে বাঁধান রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম সে রাস্তাও বুঝি মিলিয়ে গেল। রুমী ভয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললে—কি ব্যাপার বল তো?

ভয় আমিও একটু পেয়েছি, তবুও স্বাভাবিকভাবে বলবার চেষ্টা করলাম—পশ্চিম সীমান্তের এটি শেষ শহর। একে নানা বাধা-বিঘ্ন নিয়ে দিন কাটাতে হয়। তবে বিমান আক্রমণের সংকেত এটা নয়। এ একটানা বাজছে। ব্ল্যাক আউটের সঙ্কেত হবে, কারণ দেখো সব আলো সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল।

হঠাৎ দেখলাম দূরে অন্ধকারের বুকে সারি সারি মোটরের হেড-লাইট। মিলিটারি গাড়ির কনভয় আসছে। অন্ধকারে কিছুক্ষণ থাকলে চোখে সহে যায়। এ অন্ধকার চোখে সইবার আগেই মোটরের আলো চোখে পড়ে ধাঁধিয়ে গেল। রুমীকে বললাম—রাস্তা ছেড়ে নেমে এসো। কনভয়ের জন্যে যথেষ্ট পথ ছেড়ে রাখা ভাল।

তাই করলাম। আমাদের পার হয়ে যেতে লাগল একের পর এক ফৌজী গাড়ি। কোন মতে বালির ওপর দিয়ে অন্ধকার সাঁতরে আমরা ডেরায় পৌঁছলাম। হোটেল মুনের লোকরা বলল—আপনাদের বলতে ভুলে গেছি এখানে রোজ সাতটা থেকে ব্ল্যাক আউট।

জয়শলমীর দুর্গে আছে জৈন মন্দির আর জিনভদ্রের জ্ঞান-ভাণ্ডার। ১১৫৬ সালে রাজা জয়শলের তৈরী কেল্লা। কেল্লাই জয়শলমীরের সব। মরুভূমির বুকে এক স্পর্ধা। বহুদূর থেকে একে দেখা যায়। এ কেল্লার গঠন-রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। রাজস্থানের কোন কেল্লা এ ধরনের নয়, জয়শলমীরের দুর্গ সম্ভবতঃ রাজস্থানের দ্বিতীয় প্রাচীনতম দুর্গ। অর্থাৎ চিতোরের পরেই জয়শলমীরের দুর্গ। আমরা পরদিন সকালে কেল্লা দেখতে এসেছি। ভূগোলে পড়েছিলাম থর মরুভূমির কথা। ইংরেজরা বলে গ্রেট ইণ্ডিয়ান ডেসার্ট। ধু-ধু বালির রাজ্য। ভৌগোলিক নিয়ম অনুসারে গোড়াতেই হয়তো এত বড় মরুভূমি ছিল না, ক্রমেই এ প্রসারতা লাভ করেছে। যে সময়ে রাজপুত রাওল জয়শল এখানে রাজধানী জয়শলমীর করেছিলেন সে সময়ে জায়গাটা কেমন ছিল কে জানে? কিন্তু এখন জায়গাটাকে বিচিত্র লাগে। চারিদিক বিস্তীর্ণ মরু, মধ্যিখানে হলুদ পাথরের দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির আর তাকে ঘিরে এক খাবলা ব্যস্ত জনপদ দেখে মনে হচ্ছে হঠাৎ আরব্য রজনীর দেশে এসে গেছি।

কেল্লায় প্রবেশের মুখে একটা বারান্দাওলা পাথরের বাড়ি। সেই পাথরের ওপর লতাপাতা ফুলের যে রকম সূক্ষ্ম কাজ, না দেখলে বিশ্বাস করতাম না যে পাথরের ওপর এমন নিখুঁত সূক্ষ্ম খোদাই মানুষ করতে পারে। তার সামনে বালির ওপর দুজন সাহেব মেম বসে বসে মুগ্ধ হয়ে তা দেখছে। আমরা কাছে যেতে তারা জিজ্ঞাসা করল কোথা থেকে আসছি। বললাম, কলকাতা। তোমরা?

বলল, পশ্চিম জার্মানী।

ক্রমে তাদের সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হল। জার্মান দম্পতি বলল—এখানে ইচ্ছে মত ঘুরতে পারছি না। এই দেখো ক্যামেরার মুখও বন্ধ করে রাখতে হয়েছে। তোমাদের একজন লোকও সর্বদা আমাদের পাহারা দিয়ে রেখেছে।

এই বলে পাশের লোকটিকে দেখিয়ে দিল। পাশের লোকটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার? কি বলছে?

যা বলছে বললাম। লোকটি বলল—এই সর্তেই এদের এখানে কালেকটার সাহেব চলাফেরার অনুমতি দিয়েছেন। সীমান্ত অঞ্চল বলে বিদেশীদের চলা-ফেরা করা এখানে সীমিত। আমার ওপর সেই রকম আদেশই আছে।

লোকটি কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে এসে খুব অসুবিধায় পড়েছে। হিন্দী ছাড়া সে কিছু বোঝে না। আর সাহেবরা আবার হিন্দী এক বর্ণ বোঝে না! ফলে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। নীরব হয়ে লোকটি কালেক-টার সাহেবের হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছে মাত্র।

সাহেবকে বললাম—ইংরেজি ছাড়া আর কি কি ভাষা জান?

সাহেব প্রায় ডজন খানেক ভাষার হিসেব দিয়ে গেল। কিন্তু তার মধ্যে হিন্দী নেই। সাহেবকে বললাম—এবার হিন্দী ভাষাটা শিখে নাও, আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

কেল্লার ভেতরে আছে জৈন মন্দির। তার একাংশে আছে বিখ্যাত জ্ঞান-ভাণ্ডার, জিনভদ্র সুরির পুস্তকাগার। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত। পর্যটকদের কাছে জ্ঞানভাণ্ডারের আকর্ষণ একটা বিরাট আকর্ষণ। ভারতে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির এক অমূল্য সংগ্রহ এখানে রাখা আছে। এখানে আছে ১১২৬টি তালপাতার ওপর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি, ২২৫৭ খানি কাগজের পাণ্ডুলিপি। সব থেকে আকর্ষণীয় হল কালো কালিতে লেখা সাড়ে তিরিশ ইঞ্চি লম্বা তালপাতার পাণ্ডুলিপি। আর আছে ভারতীয় দর্শন, নাটক, কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেক প্রাচীন পুঁথি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কিয়দংশ আছে এখানে। কেল্লার একটু দূরেই পাটোয়ার হাবেলী। অর্থাৎ খাজাঞ্চির প্রাসাদ। পাটোয়ার হাবেলীর সূক্ষ্ম কারুকার্যই প্রকৃতপক্ষে জয়শলমীরের সব থেকে দামী কাজ। কিন্তু এই হাবেলী এখন কারুর সম্পত্তি নয়, নগরবাসীর আস্তানা।

প্রাসাদ দেখে ফেরবার সময়ে দেখলাম ঐ রোদ্দুরে একদল ছেলেমেয়ে বালির ওপর বসে বালি নিয়ে খেলা করছে। অভ্যাসে সবই হয়।

জয়শলমীর থেকে সোজা এসেছি মাউণ্ট আবু। অবশ্য সোজা আসা যায় না। মাঝখানে যোধপুরে একবার গাড়ি বদল করতে হয়েছে। যোধপুর

থেকে আবু রোড ১৬৮ মাইল। রেল-স্টেশনের নাম আবু রোড, পাহাড়ের ওপর শহরের নাম মাউণ্ট আবু। স্টেশন থেকে মাইল খানেক সমতলে যাওয়া যাবে, তারপর শুরু হয়েছে আবু পাহাড়। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে সুন্দর বাস-রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে আমাদের বাস এগোতে লাগল। এখন যেতে হবে আঠারো মাইল। চার হাজার ফুট ওপরে আবু শহর। আবু পাহাড়ের বিশেষত্ব এর একাকীত্ব। আশে-পাশে কোথাও পাহাড় নেই। চারপাশে সমতল, মধ্যিখানে আবু পাহাড় হঠাৎ ঠেলে উঠেছে। থালাতে যেন ভাত বেড়ে দিয়েছে। এখানে রাজস্থানের রুক্ষতা অনেক কমে গেছে। আবুর পরেই শুরু হচ্ছে গুজরাটের সীমা।

কর্ণেল টড আবু পাহাড়ের সন্ধান পান ১৮২২ সালে। তাঁর সন্ধানকে অনুসরণ করে পাওয়া গেল অমূল্য সব সন্ধান যার তুলনা নেই সারা পৃথিবীতে কোথাও। মহাভারতে আবু পাহাড়ের উল্লেখ আছে। প্রাচীন নাম অর্বুদাচল। ঋক্‌বেদে অর্বুদাচলের নাম পাওয়া যায়। অর্বুদ নাম থেকে আবু নাম আসতে পারে। আমাদের এক সহযাত্রী আবু পাহাড়কে ঘিরে যে পৌরাণিক গল্প আছে বলতে লাগলেন—

শিষ্য উতংক গুরু-গৃহ থেকে বিদায় নেবার সময়ে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে গুরুপত্নী বললেন—রাজা পৌষ্যের পত্নীর কানের আভরণ তাঁকে এনে দিতে হবে চারদিনের ভেতর। উতংক যখন সেই আভরণ সংগ্রহ করে ফিরছিলেন সেই সময়ে কোন এক সুযোগে তক্ষক সেটি চুরি করে লুকিয়ে রাখে। তক্ষককে খুঁজে বার করতে উতংক মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাতাল অবধি সুড়ঙ্গ করে ফেললেন। অবশেষে সেখান থেকে কর্ণাভরণ উদ্ধার করে গুরুপত্নীকে এনে দিলেন। কিন্তু মহা সুড়ঙ্গ সেইভাবে রয়ে গেল। এক দিন বশিষ্ঠ মুনির গরু নন্দিনী সেই গহ্বরে পড়ে গেল। নন্দিনী বশিষ্ঠের কামধেনু, অতি প্রিয় গরু। তাকে হারাতে তিনি রাজী নন। তিনি মহাদেবকে প্রার্থনা জানালেন নন্দিনীকে উদ্ধারের জন্যে। মহাদেব নন্দিবর্ধন নামে একজন বিশেষ দূতকে এই কাজের জন্যে পাঠালেন। নন্দিবর্ধন এসে দেখলেন সরস্বতী নদী প্রবাহিত হয়ে আগেই নন্দিনীকে গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। বশিষ্ঠ তাঁর গরুকে ফিরে পেয়েছেন। এখন কথা হল, আবারও তো নন্দিনী পড়ে যেতে পারে। তাই মহাদেব হিমালয় থেকে একখণ্ড পাহাড় পাঠালেন ঐ গহ্বরকে ভরাট করে দিতে। সেইমত কাজ হল। কিন্তু একটা অসুবিধে দেখা দিল। পাহাড় স্থির থাকছে না, টল-মল করছে। তাকে অচল করতে মহাদেব সেই পাহাড়ের ওপর রাখলেন পাদপদ্ম। পাহাড় অচল হল।

সহযাত্রী বললেন—আবু পাহাড়ে দেখবেন অচলেশ্বর মহাদেবের মন্দির

আছে। মন্দিরে মহাদেবের পায়ের ছাপ আছে। যে জায়গায় মহাদেবের পায়ের ছাপ আছে তার নীচে নাকি এখনও একটা সুড়ঙ্গ আছে যার শেষ কোথায় কেউ জানে না। লোকে বলে পাতালে চলে গেছে। পারমার বংশের রাজা ধারাবর্ষ নাকি এই সুড়ঙ্গ পাতাল পর্যন্ত গেছে কিনা পরীক্ষা করতে দীর্ঘ ছ'মাস ধরে তাতে জল ঢেলেছিলেন, কিন্তু তাতে সুড়ঙ্গ বিন্দু-মাত্র জলপূর্ণ হয় নি। এই সন্দেহের জন্যে ধারাবর্ষর ওপর অভিশাপ নেমে এসেছিল। ধারাবর্ষের পর পারমার বংশে বাতি দিতে আর কেউ রইল না।

আমি সহযাত্রীকে বললাম—আপনি মাউণ্ট আবুতে আগে আর এসেছেন ?

উনি বললেন—একাধিক বার। আমেদাবাদে থাকি, উইক এণ্ড করতে মাঝে মাঝে চলে আসি।

গল্প করতে করতে ভালই কাটছিল সময়। এক সময়ে বাস থেমে গেল। টোল-ট্যাক্স দিতে হয় প্রত্যেক যাত্রীকে শহরে ঢোকবার আগে।

সহযাত্রীটি বললেন—কোথায় থাকবেন কিছু ঠিক করেছেন ?

বললাম—না, শহরে পৌঁছে ঠিক করব।

সহযাত্রী বললেন—টোল-ট্যাক্স দিতে গাড়ি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। টেলিফোন গাইড দেখে দেখে কয়েকটা হোটেলে ফোন করে জায়গা বুক করে নিন। শহরে পৌঁছে হোটেল খোঁজার পরিশ্রম বাঁচবে। এখানে ফোন করতে পয়সা লাগে না। যত খুশী লোকাল কল করতে পারেন। এই টোল-ট্যাক্সের ভেতর ফোনের চার্জ ধরা আছে।

আবু শহরে সহযাত্রীটি এবং আমরা একই হোটেলে উঠেছিলাম। সহ-যাত্রী পরদিন স্বস্থান আমেদাবাদ ফিরে গেলেন। আমরা কয়েকদিনের জন্যে রয়ে গেলাম। ছবির মত শহর মাউণ্ট আবু। যান-বাহনের বাহুল্য নেই। পায়ে হেঁটেই ঘুরতে হবে। অল্পসংখ্যক ট্যাক্সি আছে, বলা বাহুল্য চড়া ভাড়া হাঁকে। আবু শহরের প্রাণকেন্দ্র নখি হ্রদ। ডিম্বাকৃতি বিরাট হ্রদ। নির্মল জল। ধারে সুপরিকল্পিত গান্ধী উদ্যান হ্রদের শোভা আরও বাড়িয়েছে। দূর থেকে নখি হ্রদকে ক্যালেণ্ডারের রঙিন ছবির মত দেখায়। এই হ্রদকে কেন্দ্র করেই যেন শহর গড়ে উঠছে। বাজার দোকান সবই এর কাছে। হ্রদের কাছে একটা নাতি উঁচু পাহাড়ের ওপর ওটা কি ? যেন একটা বিরাট ব্যাঙ হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। যেন এখনই নখি হ্রদে ঝাঁপ দেবে। ওটার নাম 'টোড-রক'। টোড অর্থাৎ ব্যাঙই বটে। বিরাট ব্যাঙ, প্রকৃতি বানিয়েছে। প্রকৃতির খেয়ালে মাঝে মাঝে এই রকম জিনিস গড়ে ওঠে। দেওঘরে বালানন্দজীর আশ্রম দেখে ফেরবার সময়ে ডান দিকে বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখানে দেখেছিলাম একটা বিরাট পাথরের খণ্ড হাতীর আকার

নিয়েছে। কোদাইকানালে একটা ঝর্ণা আছে যাকে দেখতে দণ্ডায়মান ভালুকের পিঠের মত! নামও তাই 'বিয়ারসোলা'।

নখি হ্রদ। কেন এমন নাম হল? নখ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে এই হ্রদ করা হয়েছিল। কি রকম? ব্যাপারটা এই রকম—

বাসকলি নামে এক ভয়ানক রাক্ষস ছিল। তার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে মর্ত্যের লোকরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজো-অর্চনা সব বন্ধ করে দিল। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তখন একটি সভা ডাকলেন। তার স্থান নির্বাচিত হল আবু পাহাড়। কিন্তু আবু পাহাড়েও রাক্ষস এসে সভা পণ্ড করতে পারে। তাই তার চোখের আড়ালে থাকবার জন্যে দেবতারা নখ দিয়ে একটি পরিখা খুঁড়ে ফেললেন থাকবার জন্যে। সেই পরিখাই এখন নখি হ্রদে পরিণত হয়েছে।

নখি হ্রদের দৃশ্য নয়নাভিরাম। সময় কাটাবার এ এক সুন্দর জায়গা। কেউ হ্রদের তীরে বসে বসে উদাস হয়ে যায়, কেউ কিনারায় গান্ধী উদ্যানে অবসর যাপন করে, কেউ বা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর—তারা নখি হ্রদের ধার ঘেঁষে যে দীর্ঘ নিরিবিলি পাকা রাস্তা চলে গেছে সেখানে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায়। মেয়ে পুরুষে সেখানে কোন ভেদ নেই। নখি হ্রদের দক্ষিণ তীরে রঘুনাথের বিখ্যাত মন্দির। চতুর্দশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম প্রবক্তা রামানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন এই রঘুনাথজীকে।

রঘুনাথজীকে দর্শন করে রুমীর প্রাণ-মন জুড়িয়ে গেল। মন্দির থেকে বেরিয়ে বলল—নখি হ্রদে কেমন মোটরবোট চলেছে। চল আমরাও একটু জলবিহার করি।

—চল।

মাউন্ট আবুতে দেখবার অনেক জিনিস আছে। তবে পাহাড়ী জায়গা বলে কষ্ট করে একটু দেখতে হবে। কোন জায়গা খুবই দুর্গম। যেমন গুরু শিখর। আবু পাহাড়ের এটি সব থেকে উঁচু শিখর, ৫৬৫৩ ফুট। চূড়োয় একটি শিবমন্দির আছে।

রুমীকে বললাম, গাইড বইতে যা যা আছে সব দেখবার দরকার নেই। গাইড বইয়ের পাতায়ই তারা থাকে। আমার গাইড বই অনুযায়ী ঘুরলেই মনে হয় তোমার হয়ে যাবে।

তাই হল। নখি হ্রদ, রঘুনাথজীর মন্দির দেখলাম। দেখলাম গোমুখ। আবু কার্ট রোডের ধারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা। কিছু দূর যাবার পর ৭০০ পাথরের সিঁড়ি ভেঙে অনেক নীচে নেমে যেতে হবে। নেমে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। নামার যেন শেষ নেই। কোথায় নামছি, কতদূর নামছি কে জানে! মাঝে মাঝে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছি কতটা নামলাম। এই পথই

তো আবার অতিক্রম করে উঠে আসতে হবে! নামা যত সোজা ওঠা তত সোজা নয়। জীবনের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। নেমে যাওয়া কত সোজা কিন্তু ওঠা? কত শক্ত! কোন কোন ক্ষেত্রে তো ওঠা একেবারেই অসম্ভব! যত নামছি সিঁড়ির শেষ নেই, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে জলধারার শব্দ পাচ্ছি। যারা ওপরে উঠে আসছে তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে আর একটুখানি! অবশেষে সেই একটুখানির হল অবসান। ৭০০ সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি বাঁধান কুণ্ড! তার ওপরে পাহাড়ের গায়ে বসান শ্বেত পাথরের গরুর মুখ থেকে জলের ধারা পড়ছে—সরস্বতী নদীর ধারা। অদূরে বশিষ্ঠের আশ্রম। শান্ত সুন্দর পরিবেশ। অযোধ্যার কুলগুরু বশিষ্ঠ মুনি। আশ্রমে আছে বশিষ্ঠ, রাম, লক্ষ্মণ ও বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীর মূর্তি। আর এক পাশে রয়েছে কামধেনু নন্দিনীর মূর্তি।

হিমালয়ের বুকে আছে গঙ্গোত্রী গোমুখ। আবু পাহাড়েও আছে গোমুখ। ভারতের দক্ষিণের শেষপ্রান্তে আছে কন্যাকুমারী। আবু পাহাড়েও আছে কন্যাকুমারী। কুমারী কন্যা বলে পরিচিত। তফাৎ শুধু এই যে সে কন্যা হলেন পার্বতী, মহাদেবকে পতীরূপে না পেয়ে কুমারী রয়ে গেলেন আর এ কন্যা কুমারী একজন শবর-কন্যা বাল্মীকিকে পতিরূপে না পেয়ে কুমারী হয়ে রইল। মূল সুর কিন্তু এক। এই জাতীয় সুরের বাণী হয় খুব সুন্দর। কাহিনীটি হল—

ঋষি বাল্মীকির ত্যাগ সংযম ইত্যাদি সব কিছুই ছিল প্রবল। এ সব দীর্ঘকালের তপস্যার ফল। বৃদ্ধা মার সঙ্গে রোজ শবর-কন্যা কাঠ আহরণ করতে জঙ্গলে আসে। প্রতিদিন শবর-কন্যাকে দেখে দেখে বাল্মীকি প্রেমে পড়ে গেলেন। সব সংযমতা ভেসে গেল। তিনি শবর-কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু কন্যার মা বাল্মীকির সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিতে নারাজ। কিন্তু যখন দেখা গেল কন্যাও চায় বাল্মীকিকে বিয়ে করতে তখন বৃদ্ধা একটা কৌশল বার করল। বাল্মীকিকে বলল, দেখো বাপু, আমার মেয়েকে বিয়ে করবার আগে তোমাকে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। ঐ পাহাড়ের চূড়ো থেকে পাদদেশ পর্যন্ত একটা রাস্তা করে ফেলতে হবে এবং তা এক রাত্তিরে করতে হবে। তোমার তপস্যার জোর কতখানি দেখব। পারবে?

পারব। বাল্মীকি রাজী। শুরু করে দিলেন রাস্তা তৈরী। শবর-কন্যার মা প্রমাদ গুনল। বাল্মীকি যে ভাবে এগোচ্ছেন তাতে ভোরের আগেই রাস্তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। মেয়ে মানুষের ছলা-কলার অভাব হয় না। বৃদ্ধা তখন মোরগের ডাক ডেকে উঠল। ব্যাস! কাজ করতে করতে মোরগের ডাক শুনে বাল্মীকি ভাবলেন ভোর হয়ে গেছে। তিনি কাজ আর শেষ করলেন না, হতাশায় ভেঙে পড়লেন। এই চাতুরী দেখে দেবতারা রেগে গিয়ে মা

ও মেয়েকে পাথর করে দিলেন। বাল্মীকিও ছাড়বার পাত্র নন। নিজেকেও এক পাথরের মূর্তি করে তাদের সামনে রেখে দিলেন যাতে কুমারী কন্যার সঙ্গে সর্বদা নয়ন বিনিময় হয়। দর্শনার্থীরা এখানে এলে এক জায়গায় এই তিনটি মূর্তিকে দেখতে পাবে। দিলওয়ারা মন্দিরে যাবার পথে আছে।

রুমী বলল—বাল্মীকি এই রকম ছিলেন? কোন পুরাণে এ গল্প পেয়েছ কি?

বললাম—নিছক স্থানীয় গল্প বলে মনে হয়। কোন পৌরাণিক বইয়ে এমন ঘটনা পাই নি।

পাঁচ মাইল দূরে আছে অচলগড়। অচলেশ্বর মহাদেবের নামে জায়গাটার নাম। ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দির। মন্দিরে আছে মহাদেবের পাদপদ্ম। ক্রমবর্ধমান আবু পর্বতকে তিনি পদার্পণ করে তিষ্ঠ বলে থামিয়ে অচল করে দিয়েছিলেন বলে তিনি অচলেশ্বর মহাদেব। মন্দিরের সামনে বসে আছে পেতলের বিশাল বাহন নন্দি। আহমেদাবাদের সুলতান মোহম্মদ বেগরা অচলগড় লুঠ করতে এসে ভেবেছিল এই পেতলের ষাঁড়টির পেটে বোধহয় ধনরত্ন লুকোন আছে। সুতরাং একে ভাঙবার চেষ্টা করা হয়। ষাঁড়ের গায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে এখনও। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক বোলতা সুলতান ও তার দলবলের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। সুলতান তখন অস্ত্রশস্ত্র ও লুটের মাল ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। যে উপত্যকা দিয়ে সুলতান পালিয়েছিল তার নাম হয়ে গেল ভ্রমরাবর্ত্য। আবু কার্ট রোডের পাশের অঞ্চল।

লোকে বলে, স্বয়ং মহাদেব নাকি বোলতাদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। ধারে কাছে কোনখানে বোলতার চাক ছিল না, অত বোলতা নয়তো এল কি করে?

অচলেশ্বরের মন্দিরের পাশে আছে খুব বড় দীঘি। টলটল জলে পূর্ণ। রাজা আদি পালের সময়ে এটি ছিল ঘিয়ের কুণ্ড। যজ্ঞের ঘিয়ে কুণ্ড ভর্তি থাকত। নাম মন্দাকিনী কুণ্ড। তিনজন দৈত্য লুকিয়ে রোজ ঘি খেয়ে পালাত। আদিপাল এক দিনে এই তিন দৈত্যকে বধ করলেন। দৈত্যরা আসত মোষের রূপ ধরে ঘি চুরি করতে। কুণ্ডের পাশে দর্শকরা তিনটি প্রমাণ-আকারের প্াথরের মোষ দেখতে পাবে এবং তাদের অদূরে ধনুক হাতে রাজা আদিপালের পাথরের মূর্তি।

যার যা পেশা সে সেই ব্যাপারে অভিজ্ঞ হবে এটাই স্বাভাবিক। ডুলি-ওলারা লোক চেনে। কোন্ লোক পায়ে হেঁটে যাবে আর কোন্ লোক ডুলিতে যাবে এটা তারা বেশ বুঝতে পারে। রুমী বুড়ী নয়, ওর বুড়ী হতে এখনও অনেক বছর বাকি! কিন্তু ডুলিওলা ঠিক চলে এল। সে অভ্রান্ত!

যদিও অচল গড়ের পাহাড় বেশী উঁচু নয় এবং ওপরে যাবার সুন্দর রাস্তা আছে, তবুও রুমী বলল ডুলিতে ছাড়া যে ওপরে উঠতে পারবো না! অচলগড় পাহাড়ের ওপরে আছে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির এবং ভৃগুর আশ্রম। মাঝ পথে আছে শান্তিনাথের মন্দির। এই মন্দিরে আছে ষোলজন তীর্থংকরের সোনার মূর্তি। মন্দিরের সেবাইতরা বললেন মূর্তিগুলোতে যা সোনা আছে তার ওজন নাকি চারশো চুয়াল্লিশ মণ।

মাউণ্ট আবুতে যা দেখবার, তার প্রায় সবই দেখা হয়ে গেছে। বাকি কেবল দিলওয়ারা মন্দির। মধুরেণ সমাপয়েৎ করব। দিলওয়ারা দেখে রাজস্থান পর্ব শেষ করব। আগে তাই রুমী একটু কেনাকাটা করে নিল। আমাকে কিনে দিল একজোড়া মাউণ্ট আবুর নাগরা। আগ্রায় উপহার দিয়েছে দয়াল-বাগের নাগরা, বোম্বেতে কোলাপুরী চপ্পল, আর আবুতে নাগরা।

বললাম—আমাকে কেবল জুতোই উপহার দিয়ে গেলে।

ও বলল—আচ্ছা, কলকাতায় ফিরে নিউ-মার্কেট থেকে এক ডজন রুমাল প্রেজেণ্ট করব।

মার্কেটিং সেরে নখি হ্রদের পাশ দিয়ে ফিরছি। সেখানে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে এক পরম বিস্ময়! রুমী বলল—দেখ তো, আমি কি ভুল দেখছি?

বললাম—চল কাছে গিয়ে দেখি।

কাছে গিয়ে দেখলাম কোন ভুল নেই—মিঃ মিত্রই। কিন্তু পাশে অপূর্ব হাস্যময়ী যুবতীটি কে? মিত্রকে ডাকবো কিনা বা ডাকা ঠিক হবে কিনা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমরা এত কাছে গিয়ে পড়েছি যে মিত্রই আমাদের দেখে ফেললেন। সে কি প্রাণ খোলা আহ্বান আমাদের জানালেন! একাই দশজনের কলরব করে উঠলেন। সেই গম্ভীর মিত্র যিনি মেপে কথা বলতেন, সর্বদা অন্যমনস্ক থাকতেন তিনি যে এত চপল হতে পারেন যেন বিশ্বাস হয় না। আমাদের দেখে ভদ্রমহিলা ঘোমটায় মুখ আড়াল করলেন।

মিত্র বললেন—আমার স্ত্রীকে খুঁজে পেয়েছি!

স্ত্রীকে বললেন—এনারা আমার বন্ধু।

আমরা নমস্কার জানালাম। রঙিন আঁচলের আড়াল থেকে টুকটুকে একটি যুক্তকর বেরিয়ে আমাদের প্রতি-নমস্কার জানাল।

মিত্র বললেন—আপনাদের পেয়ে দারুণ ভাল লাগছে।

আমি মৃদু হেসে সায় দিলাম।

মিত্র বললেন—কোথায় উঠেছেন?

বললাম—সার্কিট হাউসে।

মিত্র বললেন—আমরা আছি ঢোলপুর হাউসে। আজ সন্ধ্যেয় আমার ওখানে নেমন্তন্ন রইল। আপনারা আসবেন। আসবেন তো?

রুমী বলল—নিশ্চয়ই! আমাদের একটা ব্যাপারে বেজায় কৌতূহল হচ্ছে। যদি আমরা নেমন্তন্ন রক্ষে না করি তা হলে সেই কৌতূহল মেটাবার সুযোগটি হারাবো।

আমরা তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ঢোলপুর হাউসে মিত্রর ওখানে ঠিক সময়ে যেতে হবে।

বিকেলবেলা এদিক-সেদিক খানিক বেড়িয়ে ঠিক সূর্য-ডোববার আগে সান্-সেট পয়েণ্টে হাজির হলাম। মাউণ্ট আবুর সান্‌সেট পয়েণ্ট একটা আশ্চর্য জায়গা! পাহাড়ে জায়গার এইরকম এক একটা জায়গা থাকে যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কোথাও সান্-রাইজ, কোথাও সান্‌সেট বিখ্যাত। আবু পাহাড়ের সান্‌সেট পয়েণ্ট অন্যান্য পাহাড়ের সান্‌সেট পয়েণ্ট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক বিস্তীর্ণ সমতলের ওপর হঠাৎ জেগে ওঠা পাহাড় আবু। যেন বগি থালার মাঝখানে চূড়ো করে ভাত বেড়ে দেওয়া। আবু পাহাড়ের সান্-সেট পয়েণ্ট থেকে দেখা যাচ্ছে সমতলে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিরাট লাল সূর্য বিস্তীর্ণ সমতলের ঝাপসা কিনারায় ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। মার্তণ্ডের সে প্রখর জ্যোতি নেই। উজ্জ্বল কিন্তু চোখকে কষ্ট দেয় না এমন কমলা-লালের প্রকাণ্ড কন্দুক মিলিয়ে যাচ্ছে সমতলের কিনারায়। সমতলের ছায়া যেন আয়নার মত ওর ওপরে প্রতিফলিত হচ্ছে। আমাদের মুগ্ধ চোখের সামনে সে ধীরে ধীরে নেমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে সবটুকুই গেল মিলিয়ে! তার সর্বশেষ ভগ্নাংশটুকুকেও দেখলাম মিলিয়ে যেতে পরিষ্কার-ভাবে। আবু পাহাড়ের সূর্যাস্তের এটাই বৈশিষ্ট্য।

সূর্যাস্ত দেখার সময়ে যতখানি আনন্দ হয়, দেখার পর ততখানি বিষণ্ণতা নেমে আসে। মনে হয় কতগুলো সুন্দর মুহূর্ত হারিয়ে গেল।

ঢোলপুর হাউসে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদের অভ্যর্থনা করতে মিত্র তৈরিই রয়েছেন, পাশে অবগুণ্ঠিতা স্ত্রী। সাদরে বসালেন আমাদের।

খেতে খেতে আমাদের কথা হচ্ছিল। রুমী বলল—আমাদের কৌতূহল মেটান।

মিত্র রহস্য করে বললেন—কি ব্যাপারে?

রুমী বলল—খুলে না বললে বুঝতে আপনার কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?

মিত্র সলজ্জে বললেন—বুঝেছি।

এরপর মিত্রর কথায় যা জানা গেল তা এই—পত্নীশোকে কাতর তিনি দীর্ঘকাল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন একটু শান্তি পাবার আশায়। অনেক টাকা পয়সার মালিক

তিনি। কিন্তু সবই বৃথা মনে হয়। মনে শান্তি নেই। এবার রাজস্থান ভ্রমণে এসে কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে বিকানীরে এসে সব পালটে গেল। এক বিকানীর দুহিতার পাণি-গ্রহণ করে ফেললেন। এই যুবতীর সঙ্গে নাকি তাঁর স্ত্রীর আশ্চর্য রকম মিল আছে। বিকানীর-কন্যার পিতৃদত্ত একটা নাম ছিল বটে কিন্তু মিত্র নতুন নাম দিয়েছেন শান্তি, তাঁর আগের স্ত্রীর নাম। বিয়ের পর হনিমুন করতে মাউণ্ট আবুতে আবার চলে এলেন।

মিত্রর আতিথ্য সেরে আমরা যখন বেরোলাম মনটা বেশ হালকা লাগল। মিত্রের নৈরাশ্যকাতরতা আমাদের অবচেতন মনকে এতখানি যে দখল করে বসেছিল আগে তো বুঝি নি। এখন বুঝলাম। মিত্র শান্তি পেয়েছেন দেখে আমরাও শান্তি পেলাম। রাত্রি হয়ে গেছে। অক্টোবরের শেষ। শীতের প্রথম পদক্ষেপে আবু শহর ঝিমোচ্ছে। রাস্তায় প্রায় লোক নেই বললেই চলে। জেগে আছে কেবল রাস্তার আলোগুলো। হোটেলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা আছে 'বার'। সেখানে দু-এক জন লোকের আনাগোনা চলছে। ঢোলপুর হাউস থেকে সার্কিটহাউস মোটেই দূর নয়। আমাদের ফিরতে কোন অসুবিধে হল না। কেন জানি না আমাদের দুজনের মন এক অজানা আনন্দে ভরে রইল। মিত্র শান্তি পেয়েছেন সেই জন্যেই কি?

পরদিন আমাদের ভ্রমণ-সূচীতে ছিল দিলওয়ারা মন্দির। নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবার আমাদের সঙ্গী সস্ত্রীক মিত্র। পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় এসে দেখলাম মিত্র ও শান্তি দাঁড়িয়ে আছেন। কাছে গিয়ে বললাম—একটু দেরি করে ফেললাম কি?

মিত্র সহাস্যে বললেন—না না।

দিলওয়ারা। দেবলওয়ারা মন্দিরকে বাইরে থেকে একদম বোঝা যায় না। দিলওয়ারা মন্দিরের যত ছবি দেখেছি সব ভেতরের ছবি। এখন বুঝলাম দিলওয়ারা মন্দিরের বাইরের ছবি কেন কেউ তোলে না।

যে লোকটি এ মন্দির স্থাপন করেছিলেন তিনি ছিলেন খুব সাদাসিধে ও ধর্মভীরু। তিনি চেয়েছিলেন প্রথম ধর্মগুরু আদিনাথের নামে সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করতে। বাহ্যিক আড়ম্বরের কোন প্রয়োজন নেই। মন্দিরের বাইরেটা চমকদার করার কোন দরকার নেই। যাঁর জন্যে মন্দির তাঁকে সন্তুষ্ট করাই লক্ষ্য। মন্দিরের অভ্যন্তর হবে নিখুঁত, আনন্দময়। বাইরের আড়ম্বর যত কম হবে ততই মঙ্গলকর। মুসলমান রাজাদের কেবল লক্ষ্য লুঠ করা। বিমলশাহ যে মহামূল্য অননুকরণীয় মন্দির তৈরীর কথা ভাবছেন তা রূপ পেলে পৃথিবীর একটি বিস্ময় হবে সন্দেহ নেই। তাকে কিছুতেই মুসলমান রাজার আক্রমণের বস্তু হতে দিতে পারেন না। এ মন্দিরকে

তাই গুপ্ত রাখা হবে। সেই পরিকল্পনায় তিনি ১০৩১ সালে দেবলওয়ারা গ্রামে ঘর-বাড়ি দোকানের আড়ালে এক অতি সাধারণ জায়গায় তৈরি করলেন আদিনাথের মন্দির। বাইরে থেকে বোঝা যায় না এখানে কি সম্পদ প্রায় হাজার খানেক বছর ধরে লুকিয়ে আছে।

বিমলশাহ তখন আবু পাহাড়ের পাদদেশে চন্দ্রাবতী নগরের শাসনকর্তা। রাজা ভীমদেবের হয়ে তিনি নগর শাসন করছেন। উপাস্য অম্বাদেবীর (দুর্গা ?) কাছে তিনি দুটি বর চেয়েছিলেন। একটি সন্তান ও অন্যটি আদি-নাথের মন্দির নির্মাণ। অম্বাদেবী নাকি স্বপ্নে দেখা দিয়ে যে-কোন একটি বর বেছে নিতে বলেন। বিমলশাহ মন্দির তৈরির বরটিই বেছে নিলেন। কোথায় মন্দির হবে সে জায়গাও অম্বাদেবী নির্দিষ্ট করে দেন। যে জায়গায় বিংশতিতম জৈন তীর্থংকর মনিসুব্রত সমাধিস্থ রয়েছেন সেই জায়গায় প্রথম তীর্থংকর আদিনাথের দিলওয়ারা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশেষে ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিমলশাহ ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মন্দিরটি নির্মাণ করলেন। সম্পূর্ণ শ্বেত পাথরের অনবদ্য শিল্পের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। আদিনাথের মন্দির করলেন বটে কিন্তু তাঁকে কেন্দ্রে রেখে সুরম্য পোর্টিকো করে সেখানে বাহান্নটি ছোট ছোট মন্দিরে অন্য তীর্থংকরদেরও রাখা হল। আদিনাথের মন্দিরের সামনে আটটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত থাম অষ্টভূজ ক্ষেত্র তৈরি করে একটি গম্বুজকে ধারণ করে আছে। সেই গম্বুজের কার্নিসে যে খোদাই করা মূর্তি ও অন্যান্য নকশা আছে তারা পশ্চাৎপট থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ত্রিমাত্রিক আকার নিয়ে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই আটটি থাম আবার সূক্ষ্ম নকশাযুক্ত পাথরের দোদুল্যমান সংযোগে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। থাম থেকে শুরু করে চাতাল, দেওয়াল, ছাদ, কার্নিস কোথাও এতটুকু সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও দক্ষতার কার্পণ্য নেই। মন্দিরের সামান্য কোণটিও বিরূপ সমা-লোচনার সুযোগ দেয় নি।

মন্দিরে প্রবেশের মুখে আছে হাতিশালা। এ যেন হাতির মিছিল। একটি ঘরে দশটি হাতি। মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্যের সঙ্গে তাল রেখে এদের করা হয়েছে। সুতরাং হাতিশালা নিঃসন্দেহে দ্রষ্টব্যের একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। সব হাতির পিঠেই নাকি সওয়ার ছিল। এখন তারা উধাও। কেবল প্রথম হাতির পিঠে বিমলশাহের মূর্তি এখনও বসে আছে।

এ মন্দির বিমলবসাহি নামে পরিচিত।

বিমলবসাহির সামনে আছে লুনাবসাহি। বিমলবসাহির প্রায় দু'শ বছর পরে এটি হয়েছে। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে দুই ভাই বাস্তুপাল ও তেজপাল বড় ভাই লুনিগ'র নামে মন্দিরটি তৈরী করলেন। বিমলশাহ করেছিলেন প্রথম তীর্থংকর আদিনাথের মন্দির, এনারা করলেন নেমিনাথের মন্দির। তীর্থংকর

হিসেবে সোমিনাথের স্থান বাইশ। ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি লুনাবসাহি নাকি বিমলবসাহির থেকেও বেশী জমকাল ও শিল্পকার্যে বেশী উন্নত। বইতে সেই রকমই পড়েছিলাম। কর্ণেল টড, ফার্গুসেন প্রভৃতিরা সেই রকমই মন্তব্য করে গেছেন। হবে হয়তো। আমি বুঝলাম না। আমার বিমল-বসাহিকেই লাগল বেশী সুন্দর। হয়তো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিত্যায় আমার অজ্ঞতাই এর কারণ। লুনাবসাহির থামগুলো বিমলবসাহির মত সাজান নয়। কিন্তু ছাদ, কার্নিস ও গম্বুজের কাজ অনেক বেশী। বিষয়বস্তুও অনেক রকম। ছাদে আছে জৈন পুরাণের অনেক ঘটনা নিয়ে ভাস্কর্য। সারা মন্দির জুড়েই দেবতা, আধাদেবতা, বীরদের ভাস্কর্য। আর আছে নৌকো। মন্দির-নির্মাতাদের সমৃদ্ধি ও সম্পদ আহরিত হয়েছে বাণিজ্যের মাধ্যমে, সম্ভবতঃ সেই কথা বোঝাবার জন্যে নৌকোকে ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু করা হয়েছে! এই মন্দিরের সঙ্গে আর একজনের নাম জড়িয়ে আছে। সে নাম কিন্তু সাধারণের কাছে প্রচারিত হয়নি। তিনি হলেন অনুপমা দেবী। তেজপালের স্ত্রী। তাঁর প্রেরণায় এমন একটি ব্যয়বহুল নিখুঁত শিল্প-সম্ভারের সৃষ্টি হল। কথিত আছে মন্দির তৈরি শেষ হলে কাজ কতখানি নিখুঁত হয়েছে যাচাই করবার জন্যে তেজপাল কারিগরদের বলেছিলেন, যে কেউ অন্ততঃ একখণ্ড পাথরও মন্দিরে লাগতে পারবে যাতে মন্দিরকে আরও নিখুঁত লাগে তাহ'লে তাকে ঐ পাথরের সম-ওজন সোনা পুরস্কার দেওয়া হবে। কেউ পারেনি!

এই দুটি প্রধান মন্দির। পাশে আরও দুটি ছোট ছোট মন্দির আছে, তারা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। লুনাবসাহি তৈরী হয়ে গেলে যে অবশিষ্টাংশ পড়েছিল তাই দিয়ে নাকি বিনা পারিশ্রমিকে কারিগররা এ দুটি মন্দির করে দিয়েছিল।

দিলওয়ারা মন্দির দেখে আমাদের প্রাণ-মন ভরে গেছে। মন্দির দেখে আমরা যখন বেরোলাম বেলা শেষ হয়ে এসেছে। মিত্র শান্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন বললেন। ঘোমটার আড়ালে লুকোন মাথাটা বিরাট করে হেলিয়ে সোজা করে নিলেন শান্তি।

মিত্র আমাদের বললেন—শান্তির খুব ভাল লেগেছে।

মোটর স্ট্যাণ্ডে এসে আমরা মিত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বিদায়ের সময়ে মিত্রকে রুমী বলল—এতকাল আমরা যত জায়গা বেড়িয়েছি সব থেকে ভাল লাগল রাজস্থান। আপনারও নিশ্চয়ই তাই?

বলে মৃদু হেসে বিকানীর-দুহিতার দিকে তাকাল।

মিত্রর মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল।

সুন্দরম্